

স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

শিক্ষাভারতী প্রকাশিত

মণি বাগচির অন্যান্য বই



জননায়ক জওহরলাল

সেই বিশ্ববরেণ্য সাধক

সেই বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসী

লোকমাতা নিবেদিতা



॥ পরবর্তী বই ॥

ভারতের সাধিকা

# দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র



শিক্ষাভারতী
৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

DESHNAYAK SUBHASH CHANDRA : A Bengali biogfaphy or Subhash Chandra Bose. By : Moni Bagchee

প্রথম প্রকাশ :
সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

প্রকাশক :
শ্রীভবেশচন্দ্র বিশ্বাস
শিক্ষাভারতী
৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস ( প্রাইভেট ) লিঃ
কলিকাতা-৯

দাম : চার টাকা

প্রচ্ছদ ও আখ্যাপত্র :
শ্রীসুমুখ মিত্র

"Subhas is a flaming sword"—সরোজিনী নাইডুর এই উক্তি অনুসারেই প্রচ্ছদে জ্বলন্ত তরবারির প্রতীকটি ব্যবহৃত হয়েছে।

বিপ্লবী মহানায়ক
রাসবিহারী বসুর
পুণ্য স্মৃতিতে

আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের একটি অনন্যলব্ধ স্থান আছে। তাঁর সম্পর্কে ইতিহাস-সম্মত একখানি জীবনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে কিছুকাল আগে আমি নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর পরিচালক ও সুভাষচন্দ্রের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র ডাঃ শিশিরকুমার বসুকে একখানি পত্র লিখেছিলাম। তার উত্তরে ( ৭ই নভেম্বর, ১৯৪৭ ) তিনি আমাকে জানিয়েছেন :

"It is quite true that thc Bureau intends ultimately to publish a standard biography of Netaji. But we have yet to collect sufficient material. It is very good of you to have oflered your services in this regard"

যে উপাদানের কথা পত্রে উল্লিখিত হয়েছে, তা এই দীর্ঘকালের মধ্যে সংগৃহীত হওয়ার কথা। 'দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র' যদিও বিস্তারিত জীবনচরিত নয়, তথাপি এর মাধ্যমে আমি গান্ধী-যুগের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নেতাজীর বিচিত্র জীবন ও জীবনাদর্শ সম্পর্কে একটা মোটামুটি আলোচনা সাধারণ পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করার প্রয়াস পেয়েছি। এই গ্রন্থের যা কিছু উপাদান তা আমি তাঁর সম্পর্কে ইতিপূর্বে প্রকাশিত বাঙলা ও ইংরেজী বই থেকে এবং বিশেষ করে 'সুভাষচন্দ্রের 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' বই থেকে সংগ্রহ করেছি।

মণি বাগচি

# দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র

•

## রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুভাষচন্দ্র,

বাঙালী কবি আমি, বাঙলা দেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্ত শক্তি বাঙলা দেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজেদের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে কর্মনীতিতে শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে দাঁড়ে তালের মিল নেই। …এই রকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণহস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।

সুভাষচন্দ্র, তোমার রাষ্ট্রীক সাধনার আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে দ্বিধা অনুভব করেছি, কখনো কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা, তা নিয়ে মন পীড়িত হয়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা আর নেই, মধ্য দিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তার থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে, কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি। তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোন

পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানোনি। তোমার এই চারিত্রশক্তিই বাঙলা দেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।

... ... ... ...

তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সংকটের প্রতিমুখে আশাকে অবিচলিত রাখার দুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে। সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় আশার পতাকা বাঙলার জীবনক্ষেত্রে তুমি বহন করে আনবে, সেই কামনায় আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে—অসন্দিগ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালী আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্যে তার আসন প্রস্তুত।...বাঙালীর সম্মিলিত ইচ্ছা বরণ করুক তোমাকে নেতৃত্ব পদে, সেই ইচ্ছা তোমাকে সৃষ্টি করে তুলুক তোমার দায়িত্বে। সেই ইচ্ছাতে তোমার ব্যক্তিস্বরূপকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হোক সমগ্র দেশের আত্মস্বরূপ। আমি আজ তোমাকে বাঙলা দেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সমস্ত দেশকে।

মে, ১৯৩৯



# ১

১৯২৫ সাল, ডিসেম্বর মাস।

দূরে ইরাবতী নদীর জলে শীতের সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

মান্দালয় দুর্গ-শিরে অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা।

লাল ইঁটের তৈরি সেই বিশাল দুর্গের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক তরুণ বন্দী তন্ময়চিত্তে সেই সূর্যাস্ত দেখছেন। সাধারণ বন্দী তিনি নন, তিনি রাজবন্দী—বাঙলাদেশ থেকে নির্বাসিত এক রাজবন্দী। কোনো প্রকাশ্য আদালতে তাঁর বিচার হয়নি, তাঁর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ, তাও তাঁকে বলা হয়নি। বাঙলাদেশ থেকে আরো আটজন রাজবন্দীর সঙ্গে এই সুদূর ব্রহ্মদেশে তাঁকে নির্বাসিত করা হয়েছে। এই নির্বাসন-দণ্ড অনির্দিষ্ট কালের জন্য।

দুর্গের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছেন সেই তরুণ রাজবন্দী। মনে হয়, সূর্যাস্তের সেই রক্তঝরা আলোয় তিনি পাঠ করছেন নবযুগের অগ্নিমন্ত্র। তাঁর আয়ত দুই চোখের দৃষ্টি যেন ইতিহাসের বিশাল পটভূমিতে পরিব্যাপ্ত। এই দুর্গে একদা ১৮৮৫ সালে রাজা থিবোকে সিংহাসনচ্যুত করে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁকে বন্দী করে রেখেছিল। এই দুর্গেই একদা মহারাষ্ট্র-কেশরী বাল গঙ্গাধর টিলক তাঁর কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। এক-আধ বছর নয়, দীর্ঘ ছয় বছরকাল তিনি এই দুর্গে বন্দী-জীবন যাপন করেছিলেন। স্বাধীনতার নির্ভীক পূজারী টিলক। রাজবন্দীর মনে জাগে তাঁর স্মৃতি; দেশের মুক্তির জন্য কি অপরিসীম নির্যাতন

সাধনা দুই-ই সার্থক হয়েছিল। মান্দালয় দুর্গে রাজবন্দী সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, বিশ বছর পরে নেতাজীরূপে, আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে তিনি সেই স্বপ্ন সফল করেছিলেন। একদা যে দেশে ইংরেজ শাসকবর্গ তাঁকে বন্দী করে রেখেছিল, ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে, বিশ বছর পরে সেই দেশের মাটিতেই সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্ সরকারের প্রেসিডেণ্টরূপে তাঁর বিজয়পতাকা—ব্যাঘ্র-কেতন—সগর্বে তুলে ধরেছিলেন। দূর থেকে সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলো সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এই রাজবিদ্রোহীর কীর্তি—তাঁর অমিত বাহুবল।

"রাজদ্বারে নিবেদনের থালা লইয়া বৎসরের পর বৎসর কেবলমাত্র কাঁদুনির সুরে 'কিছু দাও, কিছু দাও' করিয়া প্রার্থনা করিলে কিছু পাইব না। গুরুতর দুঃখকে শিরে বহন করিয়া কারাদণ্ডে অবিচল থাকিয়া, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবার পূর্বে বাহুবলে উহা আমাদের অর্জন করিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথের এই উদ্দীপনাময়ী বাণী আমরা শুনেছি স্বদেশী-যুগে। বহুকাল পরে যাঁর কর্মজীবনে কবির এই বাণী স্পষ্ট রূপ নিয়েছিল তিনিই দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র। বাঙালীর দীর্ঘ একটি শতাব্দীর রাজনৈতিক চেতনা ও সাধনার যোগফল তিনি। বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ প্রদর্শিত নবজীবন পথের নির্ভীক পথিক সুভাষচন্দ্র। মুক্তিকাম ভারতের দুর্বার প্রাণশক্তির প্রতীক তিনি। আজীবন তিনি মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন, মনেপ্রাণে তিনিই বুঝেছিলেন জাতির মুক্তি স্বপ্নমাত্র নয়, ইহা অবধারিত সত্য। তাঁর জীবনের মন্ত্র ছিল বিপ্লব। সমগ্র দেশে সেদিন যে বিপ্লব আত্ম-প্রকাশের জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল তারই মর্মবাণী তিনি যেন শুনতে

পেয়েছিলেন। সেই বিপ্লব তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। ঘর ছেড়ে তিনি বাইরে এসে দাঁড়ালেন। জাতির যিনি মুক্তি প্রদাতা হবেন, তাঁর জন্য তো গৃহ নয়, গৃহসুখও নয়। তাই তো আমরা দেখলাম—অঙ্গে নিলেন তিনি বিদ্রোহের রাঙা-বাস, আর হাতে নিলেন সর্বনাশের ঝাণ্ডা। বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে একলাই তিনি দেশত্যাগ করলেন একদিন। তারপর?

মৃত্যু-সাগর মন্থন করে শতাব্দীর পটে অভ্যুদিত হোলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র, তাঁর ভাঙন-ভরা চরণের রুদ্রতালে স্পন্দিত হোল ইতিহাস। যুগান্তের রক্তিম সন্ধ্যায় মহাযুদ্ধের কলরোল ছাপিয়ে বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ আকাশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো দুটি কথা—'জয় হিন্দ্'। এই নূতন চেতনমন্ত্র জাতিকে শোনালেন জাতির মুক্তিদাতা সর্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র। সেই অগ্নিবাণীর মধ্যেই আমরা যেন প্রত্যক্ষ করলাম সুভাষচন্দ্রের জীবনের সার্থক পরিণতি। তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার কাহিনীই তাঁর জীবনের ইতিহাস।

১৮৯৭, ২৩ জানুয়ারি।

ঐ দিন দুপুরবেলায় উড়িষ্যার কটক শহরে জন্মগ্রহণ করেন সুভাষচন্দ্র। পিতা—স্বনামধন্য রায়বাহাদুর জানকীনাথ বসু; মা—প্রভাবতী দেবী। বসু-পরিবারের আদি নিবাস চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে। কিন্তু জানকীনাথের কর্মস্থল ছিল কটক। সেখানে তিনি আইন ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেন এবং কিছুকাল সরকারী উকীলের কাজও করেছিলেন। তাঁদের চৌদ্দটি সন্তানের মধ্যে আটটি পুত্র ও ছয়টি মেয়ে। সুভাষচন্দ্র পিতামাতার ষষ্ঠ সন্তান। পরিবারের মধ্যে তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়। পরবর্তীকালে তিনিই হয়েছিলেন জাতির সর্বজনপ্রিয় নেতা।

জানকীনাথের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মূলে ছিল তাঁর জাতীয়তাবাদী মনোভাব ও কঠিন চরিত্র। ১৯৩০ সালে যখন রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর সরকার দুর্ব্যবহার করেন, তখন তিনি তার প্রতিবাদস্বরূপ 'রায়বাহাদুর' উপাধি বর্জন করেন। ১৯০৫ সালে যখন তিনি সরকারী উকীলের পদে নিযুক্ত হন তখন বাঙলা দেশে দেখা দিয়েছে বঙ্গভঙ্গ-জনিত স্বদেশী আন্দোলন। সুভাষচন্দ্র তখন আট বছরের বালক; সেই বয়সেই তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিখ্যাত স্বদেশী গান ও কবিতা শিখেছিলেন। বিশেষ করে রাখীবন্ধন উৎসবের জন্য সেইসময় কবি যে গানটি রচনা করেছিলেন সেটি তাঁর খুব প্রিয় ছিল। যখন-তখন আপন মনে তিনি গাইতেন উদ্দীপনাময়ী সেই গান:

বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান্।

'হিতবাদী'-সম্পাদক পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের এই স্বদেশী গানটিও সুভাষচন্দ্রকে তখন খুব প্রেরণা দিয়েছিল:

যায় যেন মা জীবন চলে
শুধু কাজে জগৎ মাঝে
বন্দেমাতরম্ বলে।

তখন থেকেই দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করবার সঙ্কল্পটা এই দেশপ্রেমিকের মনের মধ্যে প্রথম সঞ্চারিত হয়েছিল।

ছেলেবেলায় তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'। তিনি বলেছেন, "আমার শৈশবে আমি যখন প্রথম 'বন্দেমাতরম্' গানটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম, তখন থেকেই দেশজননীর মূর্তি আমার হৃদয়ে যেন চিরদিনের মতোন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। আমার দেশপ্রেমের উৎসই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'।"

সুভাষচন্দ্র যে পরবর্তীকালে স্বাধীনতার তপস্যায় সর্বস্ব ত্যাগ

করেছিলেন, অত্যাচারীর রক্তনেত্র, নির্যাতন, নিপীড়ন উপেক্ষা করে নির্ভীক উন্নতশিরে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়েছিলেন তার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র আর রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান ও কবিতা থেকেই। এ আমরা আজ সহজেই অনুমান করতে পারি। পিতামাতার চারিত্রিক গুণাবলী অনেক সময়ে পুত্রের মানসগঠনে সহায়তা করে থাকে। সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। জানকীনাথ যেমন উন্নতচরিত্রের মানুষ ছিলেন তেমনি তিনি ছিলেন জাতীয়তার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। পুত্র সুভাষচন্দ্র উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার এই গুণগুলি লাভ করেছিলেন। তাঁর সকল পুত্রই এইসব গুণের অধিকারী হয়েছিলেন। বসু-পরিবারের স্বদেশপ্রেম তাই আমাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মা প্রভাবতী দেবীও বলিষ্ঠ মানসিকতার অধিকারিণী ছিলেন; বসু-পরিবারের তিনিই ছিলেন সর্বময়ী কর্ত্রী এবং সংসারে তাঁর শাসন ও স্নেহ তাঁর পুত্র-কন্যাদের সর্বদাই সৎপথে চালনা করতো। সুভাষ তাঁর পিতা-মাতা উভয়কেই যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন ও ভয় করতেন।

সুভাষচন্দ্রের জীবনের প্রথম ষোল বছর কটকেই অতিবাহিত হয়। তাঁর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তিনি ব্যাপটিস্ট মিশনারি স্কুলে ভর্তি হন। তাঁর অগ্রজদের সকলেই এই স্কুলে তাঁদের ছাত্রজীবন আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর ইংরেজী লেখাপড়ার সূচনা এইখানেই এবং এই স্কুলে তিনি একজন মেধাবী ছাত্র বলে গণ্য হয়েছিলেন। সবাই বলতো, হীরের টুকরো ছেলে। সেই বয়সে খেলাধূলায় তাঁর মন বড়ো-একটা যেত না; পড়াশুনা নিয়েই থাকতে তিনি ভালবাসতেন। তাঁর সময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাঙলা ভাষা অবশ্য পাঠ্য ছিল, সেজন্য তাঁকে বাঙলা শেখাতে একজন ভাল গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন, কারণ মিশনারি স্কুলে বাঙলাভাষা শিখবার তেমন সুযোগ ছিল না। সুভাষচন্দ্রের বয়স যখন বারো

বছর তখন তিনি র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। এখানে তিনি খুব ভালো বাঙলা শিখেছিলেন। এইসময় তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন বেণীমাধব দাশ; সুভাষচন্দ্র এঁর প্রতি খুব শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। তখন থেকেই তিনি যেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির হয়ে উঠলেন; কোনো বাচালতা বা চপলতা তাঁর প্রকৃতিতে দেখা যেত না। সব সময়েই বই নিয়ে থাকতেন। একটু ধর্মভাবও তাঁর মনের মধ্যে এইসময়ে দেখা দিতে থাকে। পুরীতে কত সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হোত—কটকের ওপর দিয়েই তাঁরা যাওয়া-আসা করতেন। কিশোর সুভাষ সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনধারা দেখে মুগ্ধ হতেন; মনের মধ্যে সেই কিশোর বয়সেই জেগে উঠতো প্রবল বৈরাগ্য এবং অনাসক্তির ভাব। যোগসাধনার প্রতি তিনি তখন থেকেই আকৃষ্ট হতে থাকেন।

আবার স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠ করে সেই বয়সেই তাঁর মনের মধ্যে সেবার ভাব জেগে ওঠে। "বিবেকানন্দের আদর্শই হচ্ছে আমার আদর্শ"—ইহা সুভাষচন্দ্রের নিজের কথা। অন্ধ, আতুর ব্যক্তির সেবা করবার জন্য তাঁর মন অস্থির হোত; এসব কেউ তাঁকে শেখায়নি। তাঁর বয়স যখন ঠিক পনর বছর, ঠিক তখন থেকেই স্বামীজির উদ্দীপনাময়ী রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তিনি তাঁর বইগুলি পাঠ করতে থাকেন। তিনি সেই বয়সেই বিবেকানন্দের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর আদর্শে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে যত্নবান হন। "বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"—স্বামী বিবেকানন্দের এই সুন্দর উপদেশটি যেন সেই বয়সেই সুভাষচন্দ্রের মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। সেবার ভেতর দিয়ে মুক্তি—কী সুন্দর কথা, তিনি ভাবতেন। আবার তেমনি বিবেকানন্দের স্বদেশসেবার বলিষ্ঠ আদর্শ দ্বারাও তিনি অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের বই আর তাঁর ইষ্টদেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের বাণী তাঁর চরিত্র ও প্রকৃতিকে সুন্দরভাবেই গড়েছিল। মানুষের সেবা করা, দেশজননীর সেবা করা—সেই বয়স থেকেই তাঁর চিত্তে স্থান পায় এবং তাঁর সকল চিন্তাকে উদ্দীপ্ত করে জাগত শুধু একটি আকাঙ্ক্ষা—selfless service বা নিঃস্বার্থ সেবা।

১৯১৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এলেন। পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। প্রথম হয়েছিলেন মিত্র স্কুলের প্রমথনাথ সরকার। এইসময়ে তাঁর জীবনে অকস্মাৎ প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং বাড়ির কাউকে না জানিয়ে একদিন হঠাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে তিনি তীর্থভ্রমণে এবং গুরুর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু কোথাও মনের মতোন গুরু না পেয়ে তিনি আবার ঘরে ফিরে আসেন। তখন থেকে তাঁর মনের মধ্যে এই ধারণা দৃঢ় হয় যে, জীবনে একটা গুরুতর উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য তাঁর জন্ম হয়েছে। ধর্মের বাতিক চলে গেল, কিন্তু রাজনৈতিক চেতনা তখন থেকেই ধীরে ধীরে সুভাষচন্দ্রের মনকে অধিকার করতে থাকে। কলেজে ছাত্রদের মধ্যে তখনই তিনি একজন নেতা হয়ে উঠেছেন—কলেজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তখন ছিল তাঁরই প্রাধান্য। একটা বিতর্কসভা তিনি গড়ে তুলেছিলেন এবং তাঁর সহপাঠীদের (এঁদের মধ্যে ছিলেন ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী আব্দুল ওদুদ, দিলীপকুমার রায় প্রভৃতি) তিনি ঐ সভার সদস্য হওয়ার জন্য অনুরোধ করতেন। বলতেন, আমরা যখন স্বাধীনতা লাভ করব তখন দেশে এমন অনেক লোকের দরকার হবে যারা তর্ক করতে নিপুণ। চটপট যারা চিন্তা করতে পারে না, দ্রুত সিদ্ধান্ত করতে পারে না, যাদের আত্মবিশ্বাস নেই, তেমন লোক দিয়ে দেশ শাসন অসম্ভব, দেশের কাজ করতে তারা অক্ষম। তিনি আরো বলতেন, ভারত-বাসীরা বড়ো বেশি অন্যের ওপর নির্ভর করে—কি মত-প্রকাশে,

কি কর্ম-প্রয়াসে, সকল বিষয়েই তারা পর-নির্ভর। তাঁর সহপাঠীরা দেখতেন, এমনিতে সুভাষচন্দ্র খুব বেশি কথা বলতেন না, কিন্তু যখন কোনো একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হোত, তখন দেখা যেত যে, তাঁর বাক্যের উত্তাপ ও সজীবতা সকলের অন্তরকে স্পর্শ করতো। সুভাষচন্দ্রের বিচিত্র জীবনের অনেক কাহিনী উল্লেখ করেছেন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহপাঠী দিলীপকুমার রায় তাঁর *The Subhas I knew* গ্রন্থে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রিয়দর্শন। তাঁর সহপাঠী কাজী আব্দুল ওদুদ লিখেছেন:

জানতাম এক সুভাষচন্দ্র বসুকে।
—এক সঙ্গে পড়তাম কলেজে,
চোখে তার চশমা,
রং ফর্সা, পানশে শাদা,
প্রায় রোগা গড়ন
মুখে কঠিন সংকল্পের ছাপ,—
কিন্তু প্রিয়দর্শন।
অশ্রান্ত ছিল তার বন্ধুদের দেশের পথে আহ্বান,
একদিন কাঁধে হাত রেখে বলেছিল সে অনুচ্চকণ্ঠে—
ত্যাগ করতে হবে ভোগবিলাসের পথ, হতে হবে ফকির,
ফকির হয়ে করতে হবে দেশের সেবা দশের সেবা,
—তাতেই জীবনের সার্থকতা।

এই যে বজ্র-কঠিন সংকল্প, ইহাই সর্বত্যাগী সুভাষচন্দ্রের চরিত্রকে দিয়েছিল একটা অনন্যলব্ধ গরিমা। তখন থেকেই যে এই তরুণের অন্তরে স্বদেশপ্রেমের তুষানল জ্বলছিল, তার সন্ধান সেদিন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ভিন্ন আর কেউ জানত না। তিনি যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন একদিন একটি ঘটনা ঘটলো এবং এই ঘটনাটিকে

সুভাষচন্দ্র স্বয়ং তাঁর জীবনের দিক্-পরিবর্তন-সূচক বলে উল্লেখ করেছেন। এ ঘটনাটি অনেকেরই জানা আছে।

তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন ওটেন সাহেব। খুব বদমেজাজী। একদিন তিনি একটি ছাত্রকে যৎপরোনাস্তি অপমান করেন এবং বার বার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি এর জন্য মাপ চাইতে রাজী হন নি কিছুতেই। এই প্রসঙ্গে দিলীপকুমার লিখেছেন ঃ "অপমানিত ছাত্রসমাজের জন্য কর্তৃপক্ষ কিছুই করেন না। আমাদের সবারই কিন্তু মেজাজ গরম হয়ে ওঠে,—যখন তখন সাংঘাতিক একটা কিছু করা বিচিত্র নয়। সুভাষের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে অনুমান করি আসন্ন একটা কিছু। তারপর এলো সেই আসন্ন ঝড়।"

সুভাষচন্দ্রের কাছে সেদিন ঘটনাটি তুচ্ছ বা সামান্য বলে মনে হয়নি; তিনি এর মধ্যে অনুভব করলেন ভারতীয় যৌবন-শক্তির অমর্যাদা। সেইসময়ে এই ঘটনাটির উল্লেখ করে তাঁর অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে তাঁর ঘনিষ্ঠ সতীর্থ হেমন্তকুমার সরকারকে এক চিঠিতে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন ঃ "ভারতে আজ নবজীবনের সঞ্চার হয়েছে।...আমরা ভাগ্যবান যে আমরা এই যুগের মানুষ...নৈরাশ্য দূর হোক, আমাদের সামনে ঐ যে আলোকোজ্জ্বল পথ, এসো আমরা ঐপথের অনুসরণ করি।" হেমন্তকুমারও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বাঙলায় 'সুভাষচন্দ্র' নামে একখানি সুন্দর জীবনচরিত রচনা করেছেন; এই গ্রন্থে তিনি সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন ও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

যাই হোক, ঘটনাটি চরমে উঠলো যেদিন সুভাষচন্দ্র কয়েকটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কলেজের মধ্যে সেই অধ্যাপককে বেশ উত্তম-মধ্যম দিয়েছিলেন। খবরের কাগজে এই সংবাদ পাঠ করে সবাই স্তম্ভিত হয়। "সবাই বুঝতে পেরেছিল এই প্রহার-পর্বের মূলে

সুভাষ রয়েছে। দলপতির সমস্ত অপরাধের দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল সুভাষ। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষের কীর্তি-কাহিনী মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল—সে হয়ে উঠল হিরো। এরপর থেকে সে যেন পুলিসের লক্ষ্য হয়ে রইল।”

১৯১৬ সালের এই ঘটনার ফলে সুভাষচন্দ্র দু' বছরের জন্য কলেজ থেকে বিতাড়িত হলেন। ঘটনাটি যখন কলেজের সীমানা অতিক্রম করে বাইরে জানাজানি হয় তখন শ্বেতাঙ্গ-সমাজে এই নিয়ে তুমুল চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। ইংরেজ শাসকের খাতায় সেদিন থেকেই সুভাষচন্দ্রের নাম লেখা হয়ে গেল—সেদিন থেকেই শাসকের রক্তচক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় তাঁর ওপর। আবার এই ঘটনাটি উপলক্ষ করে কলিকাতার ছাত্রমহলে সুভাষচন্দ্র বিশেষ পরিচিত হন। সেদিন এই ঘটনাটিতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিচলিত বোধ না করে পারেন নি এবং তিনি 'সবুজপত্র' পত্রিকায় 'ছাত্রশাসনতন্ত্র' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি এই প্রবন্ধে ছাত্রদের আচরণকে সমর্থন করেন নি, কিন্তু অবমানিত হয়ে ছাত্রেরা যে কাণ্ডটা করেছিল, তাদের পক্ষে ইহা অস্বাভাবিক, এ কথাও বলেননি —অপমানকে সহ্য করার জন্য তিনি কোনোদিন বাঙালির ছেলেকে উপদেশ দেননি। তখন থেকেই সুভাষচন্দ্রের ওপর কবির স্নেহদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

কলেজ থেকে বিতাড়িত হওয়ার জন্য সুভাষচন্দ্র গর্ব অনুভব করলেন এই মনে করে যে, তিনি জাতির আত্মসম্মানবোধকে দেশের তরুণদের সামনে নূতন করে তুলে ধরতে পেরেছেন। এক বছর কেটে গেল। কি যে করবেন, সুভাষচন্দ্র কিছুই ঠিক করতে পারছিলেন না। এইসময়ে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ময়দানে বেড়াতে এসেছেন তিনি। সেইখানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। আচার্যদেব প্রতিদিন সন্ধ্যায় ময়দানে বেড়াতে আসতেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর অনুরাগী ও পরিচিত অনেকেই থাকতেন।

এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ। এই প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ ঘোষ লিখেছেন: "আমরা ময়দানের মধ্যেই সবাই বসিয়াছিলাম, সন্ধ্যার অন্ধকারে ধীরে ধীরে সুভাষ আসিয়া উপবেশন করিলেন। বিষণ্ণবদনে সুভাষকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আচার্যদেব তাঁহাকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কেমন আছ? কি করিবে ঠিক করিয়াছ? সুভাষ ধীরে ধীরে বলিলেন, কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না, স্যার; এক বৎসর তো আরো বসিয়াই থাকিতে হইবে—কলেজে পড়া হইবে না। তারপর দেখি বাবা কি বলেন।"

সেদিন কে কল্পনা করতে পারত যে সেই আশাহত, মনঃক্লিষ্ট যুবক একদিন বিশ্ববিখ্যাত নেতাজী সুভাষচন্দ্রে পরিণত হবেন—যাঁর বীরত্ব, তেজস্বিতা ও দেশভক্তির তুলনা ইতিহাসে দুর্লভ।

কটকে ফিরে গেলেন তিনি এবং কিছুকালের জন্য সেইখানে সমাজ-সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তখন তাঁর বয়স উনিশ বছর—তাই এই ঘটনাটি তাঁর মনে গভীর দাগ কেটেছিল—শাদা ও কালোর বর্ণ-বৈষম্য তরুণের চিত্তে জাগিয়ে তুললো তীব্র স্বদেশপ্রেম। পিতা জানকীনাথ ও তাঁর অগ্রজরা সকলেই এই ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ ভেবে কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। যাইহোক, একবছর পরে ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্র আবার কলেজে পড়বার অনুমতি পেলেন। এইবার তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলেন এবং ১৯১৯ সালে প্রথমশ্রেণীর অনার্স-সহ দর্শনশাস্ত্রে বি. এ. পাস করলেন। ঐ সময়ে তিনি ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোরেও যোগদান করেছিলেন।

## ২

জানকীনাথের সকল পুত্রই কৃতবিদ্য।

কিন্তু একটি ছেলে সিভিলিয়ান হয়, এই রকম ইচ্ছা তিনি মনের মধ্যে পোষণ করতেন। তাই সুভাষচন্দ্র যখন বি. এ. পাস করলেন তখন তাঁকে পিতার আদেশে বিলাত যেতে হোল আই. সি. এস. পড়তে। ছেলেকে বিলাত পাঠিয়ে দেওয়ার আরো একটি কারণ ছিল। মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবে দেশের লোকের মনে তখন প্রবল রাজনৈতিক চেতনা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। বিশেষ করে রৌলট বিল পাশ হওয়ার পরে পাঞ্জাবের অমৃতসরে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, সারা দেশে তার বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে। পুত্রের মনের খবর পিতার নিকট অজানা ছিল না; পাছে সুভাষচন্দ্র এই আবর্তের মধ্যে গিয়ে পড়েন সেজন্য জানকীনাথের উদ্বেগের সীমা ছিল না। তাই তিনি আই. সি. এস. পড়বার জন্য ছেলেকে যথাশীঘ্র বিলাত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।

সুভাষচন্দ্রের কিন্তু এ বিষয়ে ঘোর আপত্তি ছিল। এইসময়ে তাঁর এক সহপাঠীকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "আমাকে এখনই বিলাত যাত্রা করিতে হইবে; সকলের ইচ্ছা আমি কয়েকমাস পড়িয়া Civil Service পরীক্ষায় appear হই···আমার নিজের ইচ্ছা বিলাতে ইউনিভারসিটি ডিগ্রী লাভ করা।" অবশ্য উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তাঁর নিজের বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা খুবই ছিল, কিন্তু

আপত্তি ছিল আই. সি. এস. পড়াতে। কিন্তু মুস্কিল ছিল এই যে যদি বলেন আই. সি. এস. পড়বেন না, তাহোলে বিলাত যাওয়ার প্রস্তাব বাতিল হয়ে যেতে পারে। তাই, তাঁর নিজের কথায়, অনেক সংগ্রামের পর তিনি বিলাত যাওয়া সম্বন্ধে রাজী হয়েছিলেন এবং ১৯১৯ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা থেকে জাহাজে বিলাত রওনা হন। বিদেশে নূতন পরিবেশের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র অল্প-দিনের মধ্যেই বেশ খাপ খাইয়ে নিলেন এবং যথাসময়ে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। এখানে ইংরেজ ছাত্রদের সঙ্গে মেলা-মেশার ফলে ক্রমশ তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে—শাদা চামড়ার মানুষমাত্রেই মন্দ—এই ভাবটা ক্রমশ অন্তর্হিত হয়। তবে ইংরেজ-বিদ্বেষ ছিল তাঁর সহজাত সংস্কার, এর প্রভাব তিনি কোনোদিনই কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু ইংরেজ-চরিত্রের অনেক সদ্‌গুণের পরিচয় তিনি এখানে এসে প্রত্যক্ষভাবে পেলেন; তিনি দেখলেন, এ জাত কর্মঠ, শৃঙ্খলাপ্রিয়তা এদের জাতীয় চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সময়ের মূল্য এরা খুব বোঝে, এবং মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার এখানে মনুষ্যোচিত দেখতে পাওয়া যায়।

কেমব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের একটি সমিতি আছে, তার নাম Indian Majlis বা শুধু 'মজলিশ'। সুভাষচন্দ্র মজলিশের অন্যতম সভ্য ছিলেন। এর সাপ্তাহিক অধিবেশনে মাঝে মাঝে বাইরে থেকে বিখ্যাত বক্তারা এসে বক্তৃতা করতেন। তাঁর সময়ে মজলিশের সাপ্তাহিক অধিবেশনে যাঁরা বক্তৃতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু, সাংবাদিক হর্নিম্যান, বিখ্যাত সমাজসেবক ও রবীন্দ্রনাথের শিষ্য চার্লস এণ্ড্রুজ ও বাল গঙ্গাধর টিলকের কথা সুভাষচন্দ্র এক পত্রে উল্লেখ করেছেন। তাঁর কেমব্রিজের জীবন সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায় সুভাষচন্দ্রের 'পত্রাবলী' থেকে—বিশেষ করে ঐ সময়ে তাঁর অন্যতম বন্ধু হেমন্তকুমার সরকারকে লেখা চিঠিগুলি থেকে।

আট মাসের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র তৈরি হয়ে যথাসময়ে আই. সি. এস. পরীক্ষা দিলেন এবং উত্তীর্ণদের মধ্যে তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করে সবাইকে চমৎকৃত করলেন। কটকে যখন পুত্রের এই কৃতিত্ব-লাভের সংবাদ এসে পৌঁছলো তখন পিতা জানকীনাথ সবচেয়ে সুখী হলেন এবং স্ত্রী প্রভাবতী দেবীকে এই সুসংবাদ দিয়ে তিনি তাঁকে বলেছিলেন, এইবার তোমার ছেলে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে ফিরছে। কিন্তু পিতার মনের এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। কারণ তিনি বহুজন-আকাঙ্ক্ষিত সিভিল সার্ভিসের চাকরি অতি সহজেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

১৯১৯ থেকে ১৯২১-এর মার্চ মাস পর্যন্ত ইংলণ্ডে সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাস করবার পর ১৯২১ সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সসম্মানে দর্শনশাস্ত্রে ট্রাইপোজ পাস করেন। তাঁর কেমব্রিজের জীবন সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন দিলীপকুমার; এইসব ঘটনা থেকে তাঁর মনে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। "সুভাষ বিতর্ক সভার ব্যবস্থা করত। ইউরোপীয় কূটনীতির শুষ্ক, সূক্ষ্ম সব কিছু নিয়ে বিস্তর আলোচনা করত।...তার্কিক হিসাবেও সে দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে। সবাই তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। সব সময়ে সে গোছ-গাছ থাকত, কখনো দেখিনি যে তার সোফা অথবা কৌচে কোনো বই পড়ে রয়েছে। তার ঘরের কাগজ-পত্র থেকে সব কিছুই বেশ গোছানো থাকত। জামা-কাপড়ও সর্বদা পরিষ্কার। তার পোশাকের চাকচিক্য না থাকলেও কোথাও খুঁত থাকত না—নিখুঁত ভাঁজ, একটু এদিক-ওদিক দেখিনি তার ট্রাউজারে, না দেখেছি কোটে কোনো নোংরা দাগ।...তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভারতের সুনাম অর্জন করা। ইংলণ্ডের মতোন আমাদের ভারতবর্ষও আশা করে যে প্রত্যেকটি লোক তার কর্তব্য পালন করবে—একথা সুভাষ প্রায়ই বলত।"

ইংলণ্ডে তাঁর ছাত্রজীবনের আর একটি ঘটনা হোল ডাক্তার এন. আর. ধরমবীরের সঙ্গে বন্ধুত্ব। সত্যিকার দেশপ্রেমিক এবং পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপৎ রায়ের বন্ধু ধরমবীর পাঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন। তখন তিনি ল্যাঙ্কাশায়ারে বেশ পশার জমিয়েছেন। ১৯২১ সালে কিছুদিন সুভাষচন্দ্র ও তাঁর বন্ধু দিলীপ-কুমার দুজনেই তাঁর ল্যাঙ্কাশায়ারের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। ধরমবীরের পত্নী ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা ; তাঁকে সুভাষচন্দ্র দিদি বলে ডাকতেন। "ইংলণ্ডের এই একটিমাত্র মহিলার কাছে সুভাষ উচ্ছ্বসিত হয়ে মনের দুয়ার উন্মুক্ত করেছিল।" সুভাষ-চন্দ্র যখন আই. সি. এস.-এ ইস্তফা দেন তখন ডাক্তার ধরমবীর নিজে এসে অভিনন্দিত করেছিলেন তাঁকে। সুভাষচন্দ্রের অন্তরে ফল্গুধারার মতোন প্রবাহিত দেশপ্রেমের কথা তিনি জানতেন।

দিলীপকুমার লিখেছেন : "সুভাষের জীবনে ইংলণ্ডে থাকার সময়টুকুই বোধ হয় তার জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ। কারণ এর মধ্যে ছিল না পারিপার্শ্বিকের বোঝা চাপানো বড় একটা কিছু—শুধু সেই মানুষটির চরিত্রের এক-একটা দিক স্বভাবের আপন নিয়মে ধরা দিয়েছিল, আর কোনো বাহ্যিক বাহুল্যের অলঙ্কার সেই মানুষটিকে ঘিরে ফেলতে পারেনি তখনো।"

আই. সি. এস. পাস করবার পর মেজদাদা শরৎচন্দ্র বসু যখন কনিষ্ঠকে অভিনন্দিত করে পত্র লেখেন তখন তার উত্তরে সুভাষচন্দ্র ১২.৯. ১৯২০ তারিখে যে চিঠিখানা অগ্রজকে লিখেছিলেন তার থেকে এখানে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত হোল। তিনি লিখেছিলেন : "জানি না আই.সি.এস. পরীক্ষা পাস করিয়া আমার কী তেমন লাভ হইয়াছে। ··· চাকরিজীবনে মোটা মাহিনা এবং তাহার পর মোটা পেন্‌সন্ আমার বরাদ্দ থাকিবে তাহা জানি। দাসত্বে যদি যথেষ্ট কুশলতা

অর্জন করি তাহা হইলে একদিন কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত হইবার আশা আছে। কিন্তু চাকরিকেই কি আমার জীবনের শেষ লক্ষ্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? চাকরিতে সাংসারিক সুখ পাওয়া যাইবে, কিন্তু সেটা কি আত্মার মূল্য দিয়াই ক্রয় করিব?"

"আত্মার মূল্য দিয়া ক্রয় করিব?"—এই একটিমাত্র উক্তির মধ্যেই আভাসিত হয়েছে সুভাষ-মানস। তাঁর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলেই বুঝলেন সুভাষচন্দ্র চাকরি করবেন না। বিলাতে থাকতেই তিনি স্পষ্টই উপলব্ধি করলেন যে, সিভিল সার্ভিসের সোনার খাঁচায় একবার প্রবেশ করলে তাঁর প্রাণশক্তি পাখা ঝাপটিয়ে মরবে; উন্মুক্ত আকাশে আর কোনোদিন তিনি ডানা মেলে দিতে পারবেন না। বিলাতে থাকতেই তিনি নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন এবং সেই একই সঙ্গে ভারতে যে রাজনৈতিক জাগরণ তখন দেখা দিয়েছে মহাত্মা গান্ধীকে কেন্দ্র করে, সুভাষচন্দ্র যেন হৃদয় দিয়ে তারও উত্তাপ অনুভব করলেন। তারপর যেদিন দেশের স্বাধীনতার জন্য চিত্তরঞ্জন দাশের অভূতপূর্ব ত্যাগের সংবাদ তিনি জানতে পারলেন সেদিন সুভাষচন্দ্রের মনে আর কোনো দ্বিধা বা সংশয় রইল না। চাকরিতে ইস্তফা দেবেন, তিনি ঠিক করলেন।

এই প্রসঙ্গে দিলীপকুমার লিখেছেন: "সুভাষ যখন সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে জানান যে কোনো বৈদেশিক রাজতন্ত্রের অধীনে সে চাকরি করতে পারবে না, তখন ভারতের আণ্ডার-সেক্রেটারি লর্ড লিটন তাঁকে ডাকিয়ে বৃথাই ফেরাবার চেষ্টা করলেন।" কথিত আছে, সুভাষচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন—"কোনো মানুষই একই সঙ্গে ব্রিটিশরাজের অনুগত হয়ে ভারতবর্ষের সেবা করতে পারে না, তা সে যতই চেষ্টা করুক না কেন।"

১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসের শেষভাগে অগ্রজ শরৎচন্দ্রকে আর এক পত্রে সুভাষচন্দ্র লিখলেন: "নীতি অনুসারেই আমি

এই শাসনযন্ত্রের অংশ হওয়ার কথা চিন্তা করিতে পারি না। বর্তমানে ইহা বিকল, ইহার প্রয়োজনের দিন বিগত। · আমি জানি আমার এই হঠকারিতায় আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকে তুমুল সোরগোল তুলিবেন, কিন্তু তাঁহাদের মতামতে, নিন্দায় অথবা প্রশংসায় আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু আপনার আদর্শবাদে আমার আস্থা আছে, তাই আপনার নিকট আবেদন করিতেছি। ...পাঁচ বৎসর আপনি স্বেচ্ছায় এবং মহৎভাবে আমাকে যে নৈতিক সমর্থন জানাইয়াছিলেন আজো তাহা পাইব, এ আশা করিতে পারি না কি?"

আরো একখানা চিঠিতে সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে লিখলেন: "আত্মত্যাগের আদর্শ লইয়াই জীবন আরম্ভ করিতে চাই, আমার কল্পনায় ও প্রবণতায় অনাড়ম্বর জীবন ও উচ্চ চিন্তা এবং দেশের কাজে উৎসর্গীকৃত জীবনের আকর্ষণ প্রবল। তাহা ছাড়া, বিদেশী শাসকের চাকরি করা অতি ঘৃণ্য কাজ বলিয়া মনে করি। অরবিন্দ ঘোষের পথই আমার নিকট মহৎ, নিঃস্বার্থ অনুপ্রেরণার পথ, যদিও সে পথ কণ্টকাকীর্ণ।" আজ আমরা অনুমান করতে পারি যে, তাঁর জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে সুভাষচন্দ্রের মনশ্চক্ষুতে অরবিন্দ ঘোষের দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল। তিনি তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চাইলেন।

অরবিন্দ ঘোষ (যিনি পরবর্তীকালে দিব্যজীবনের ঋষি শ্রীঅরবিন্দ নামে খ্যাত হয়েছিলেন।) সাত বছর বয়সে বিলাত গিয়েছিলেন ও চৌদ্দ বছর কাল সেখানে পড়েছিলেন। আজ পর্যন্ত আর কোনো ভারতীয় সন্তান এত দীর্ঘকাল বিলাতে থেকে লেখাপড়া করেন নি। ১৮৯০ সালে উনিশ বছর বয়সে অরবিন্দ আই. সি. এস. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করে সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় অরবিন্দ প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু যেহেতু তিনি দেশে ফিরে ইংরেজের অধীনে চাকরি করবেন না

ঠিক করেছিলেন, সেইজন্য তিনি ইচ্ছা করেই ঘোড়ায়-চড়ার ( Riding test ) পরীক্ষায় উপস্থিত হন নি। পিতার আগ্রহের জন্যই তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তারপর ১৮৯২ সালে কেমব্রিজের কিংস কলেজ থেকে তিনি ট্রাইপোজসহ প্রথম বিভাগে বি. এ. পাস করেন। ১৮৯১ সালে ভারতে ফিরে তিনি চৌদ্দ বছরকাল বরোদায় রাজ কলেজে অধ্যাপনা করেন; তারপর বঙ্গভঙ্গের দিনে কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন ও ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন। এদেশে সশস্ত্র বিপ্লবের তিনিই ছিলেন রণগুরু। কিন্তু সে ইতিহাস স্বতন্ত্র।

সুভাষচন্দ্র যে বছর বিলাত যান আই. সি. এস. পড়তে, সেই সময়ে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশে যে পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করেছে তার কিছুটা তিনি প্রত্যক্ষ করে গিয়েছিলেন। তারপর ১৯২১ সালে দেশে ফিরে তিনি যখন রাজনীতিতে যোগদান করেন তখনকার পটভূমিকাটি আমাদের একটু জানা দরকার। ১৯২০ সালে অমৃতসরে জালিনওয়ালাবাগে যে অমানুষিক হত্যাকাণ্ড হয় তারই ফলে মহাত্মা গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক মত পরিবর্তন করে অসহযোগনীতি গ্রহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ ধন দিয়ে জন দিয়ে ইংরেজকে সাহায্য করেছিল এবং সেই সময়ে এর বিনিময়ে শাসকবর্গ স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতিও আমাদের দিয়েছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতির নমুনা দেখা গেল যখন মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার ঘোষিত হোল। এই সংস্কার কংগ্রেসের একশ্রেণীর নেতাদের খুশি করলেও, বেশির ভাগ নেতাই বিক্ষুব্ধ হলেন। ঐ একই সময়ে রৌলট আইন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ভারতীয় নেতাদের মনে শাসকজাতির সদিচ্ছায় [illegible] জাগে। সে[illegible]য় পরিণত হয় ক্ষোভে।

তারপর অমৃতসরের নৃশংস হত্যাকাণ্ড সেই বিক্ষুব্ধ মনোভাবকে প্রধূমিত করে তুললো। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ রাজদত্ত খেতাব 'নাইটহুড' (knighthood) ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এরই পরিণতি গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন। ১৯২০ সালের নাগপুর কংগ্রেসে তাঁর অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হোল। সেদিন তিনি "এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ লাভ হবে" এই কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। বাঙলাদেশে এই অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। সর্বস্ব ত্যাগ করে—বিশেষ করে ব্যারিস্টারি ত্যাগ করে—তিনি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর এই দৃষ্টান্ত সেদিন বাঙলা দেশে জাগিয়ে দিল অভূতপূব সাড়া, বাঙালীর চিত্তে এনে দিল নূতন অনুভূতি। তাঁর বিরাট ত্যাগের আদর্শ এক বিপুল ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করল। সেই তরঙ্গের দোলা গিয়ে লাগল অবশেষে বিলাতে এক তরুণের চিত্তে।

সেই তরুণ সুভাষচন্দ্র বসু।

কেমব্রিজ থেকে ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২১, দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মনিবেদন করে তিনি একখানি সুদীর্ঘ চিঠি লিখলেন চিত্তরঞ্জনকে। চিঠিখানি তিনি তাঁর এক বিশ্বাসী বন্ধুর মারফৎ পাঠিয়েছিলেন। সেই অবিস্মরণীয় পত্রের প্রতিছত্রে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর যৌবনোচিত উৎসাহ আর জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম। চাকরি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে তিনি দেশের কাজ করবেন তারো একটা সুনির্দিষ্ট আভাস আছে এই চিঠিতে। পত্রের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল :

"আপনি আজ বাঙলা দেশে স্বদেশ-সেবাযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট এই পত্র লিখিতেছি। আপনারা ভারতবর্ষে যে আন্দোলনের বন্যা তুলিয়াছেন তাহার তরঙ্গ চিঠি ও খবরকাগজের ভিতর দিয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখানেও তাই মাতৃভূমির আহ্বান শুনা গিয়াছে। কেমব্রিজে অসহযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা খুব বেশি রকম চলিতেছে। আপনি বাঙলাদেশে

আমাদের সেবাযজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক—তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি—আমার যৎসামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার বিশেষ কিছুই নাই—আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর।... আপনার মতের জন্য আমি অপেক্ষা করিতেছি। আপনি কি কি কাজে আমাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, তাহা জানিবার জন্য আমি ব্যগ্র আছি।"

তারপর ২রা মার্চের আর একখানি পত্রে তিনি চিত্তরঞ্জনকে চাকরি ছেড়ে দেওয়া সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ও সংকল্পের কথা জানিয়ে আবার লিখলেন যে, দেশের কাজে নামতে তিনি বদ্ধপরিকর। সেদিন বাঙলা দেশে স্বদেশসেবার যে মহাযজ্ঞের আয়োজন হয়েছিল চিত্তরঞ্জন ছিলেন তারই প্রধান পুরোহিত। সেইজন্যই সুভাষচন্দ্র তাঁকে পত্র লিখেছিলেন। আমলাতন্ত্রের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে সুভাষচন্দ্রের মতোন একজন কৃতবিদ্য তরুণ দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন—এই কথা জেনে সেদিন চিত্তরঞ্জন যারপরনাই উৎসাহ বোধ করেছিলেন। আগ্রহের সঙ্গে তিনি সেই তরুণকে বুকে তুলে নিলেন। জনসেবায় এইরকম আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তের সেদিন খুব প্রয়োজন ছিল। দেশবন্ধুর বিরাট ত্যাগের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের এই মহৎ আত্মত্যাগ মিলিত হয়ে এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সেদিন সত্যিই একটি নূতন অধ্যায় রচনা করেছিল। সমস্ত সাংসারিক আকাঙ্ক্ষা বর্জন করে দেশের মুক্তির জন্য নিজেকে এইভাবে বিলিয়ে দেওয়া—এর মহিমা বুঝেছিলেন একমাত্র দেশবন্ধু। তাই তো তাঁকে প্রকাশ্য সভায় গর্বের সঙ্গে বহুবার বলতে শোনা গিয়েছে—"I have given Subhas to the country"—"দেশের কাজে আমি দিয়েছি সুভাষকে"—এই উক্তিটি গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ভারতবর্ষ থেকে বহুদূরে, সাগরের ওপারে দাঁড়িয়ে তরুণ সুভাষচন্দ্র দেশ-জননীর চরণে নিবেদন করলেন ভক্তির অঞ্জলি। স্থির

করলেন তাঁর কর্তব্য—স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু। সিভিল সার্ভিসের স্বর্ণপিঞ্জর নয়, দেশসেবার কণ্টকাকীর্ণ পথই তিনি বেছে নিলেন। এইবার শুরু হোল তাঁর বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক জীবন।

# ৩

১৯২১। জুলাই মাস।

দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সুভাষচন্দ্র—শুরু হোল তাঁর জয়যাত্রা। বোম্বাইতে পৌঁছে প্রথমে তিনি দেখা করলেন গান্ধীর সঙ্গে। নবীন ভারতের নেতা গান্ধী, অসহযোগ মন্ত্রের উদ্গাতা তিনি। সমস্ত দেশ তখন গান্ধীর নামে মুখরিত। তাঁকে দেখবার এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলবার আগ্রহ ও কৌতূহল থাকা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে স্বাভাবিক। সুভাষচন্দ্র বসু নামে এক তরুণ বাঙালীসন্তান দেশের কাজে আই. সি. এস.-এর চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরছেন—এই সংবাদটা গান্ধীরও জানা ছিল। সিভিল সার্ভিসের ইতিহাসে এমন ঘটনা এদেশে এর আগে আর ঘটেনি। পরেও নয়। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ সুভাষচন্দ্র নিজেই লিপিবদ্ধ করেছেন এইভাবে ঃ

"সেদিন অপরাহ্নের দৃশ্যটি আমার স্মৃতিতে আজো উজ্জ্বল হয়ে আছে। আমাকে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হোল; ঘরটির মেঝে আগাগোড়া কার্পেট দিয়ে মোড়া। মেঝের মাঝখানে, দরজার দিকে মুখ করে বসেছিলেন মহাত্মা গান্ধী তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ অনুচর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে। সকলেরই পরনে দেশী খদ্দরের কাপড়। আমি ছিলাম বিদেশী পোষাকে সজ্জিত, তাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে আমি নিজেকে একটু দলছাড়া মনে করলাম এবং সেজন্য আমি ক্ষমা না চেয়ে পারলাম না। মহাত্মা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিক হাস্যদ্বারা আমাকে অভ্যর্থনা করলেন ও আমাকে স্বচ্ছন্দ্যে কথা বলতে বললেন। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা তখনি শুরু হোল। তাঁর অসহযোগ পরিকল্পনাটি আমি বিশদভাবে জানতে চাইলাম—জানতে চাইলাম এর পরবর্তী স্তরগুলি কি

এবং কিভাবে অবশেষে এর দ্বারা আমরা বিদেশী শাসকশক্তির হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারব। এই সম্পর্কে আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলাম এবং মহাত্মা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্যের সঙ্গে একে একে সেগুলির উত্তর দিতে লাগলেন।"

কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে আলোচনায় তাঁকে নিরাশ হোতে হোল ; নৈরাশ্যের কারণ অহিংসা। সুভাষচন্দ্র বুঝতেন কাজ, অহিংসা নয় ; বুঝতেন বিপ্লব, সদিচ্ছা নয়। গান্ধী-পরিকল্পিত নীতিদ্বারা ব্রিটিশ সরকারের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে—এ কথা সুভাষচন্দ্র কোনোদিনই বিশ্বাস করতেন না এবং কাউকে তা বিশ্বাস করতেও তিনি বলতেন না। তিনি বুঝলেন, যে আন্দোলন দ্বারা ভারতবর্ষ তার ঈপ্সিত স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছবে, সেই আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে গান্ধীর পরিষ্কার ধারণা নেই। নিরাশ হয়েই তিনি বোম্বাই থেকে ফিরলেন কলিকাতায় এবং এখানে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং আলোচনা করে তাঁর মন বলল—এই তো নেতা পেয়েছি।

চিত্তরঞ্জন দাশ।

বাঙলায় তখন সকলের মুখে মুখে এই নামটি ফিরছে।

বিপুল বৈভবের শিখর থেকে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ যেদিন পথের ধূলায় নেমে জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন, সেদিন তাঁর দেশবাসী মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে দেখল সেই রাজ-বৈরাগীর দিকে। কোথায় গেল সেই বিলাস-ব্যসন আর বিপুল ঐশ্বর্য—রাজার দুলাল হয়েছেন পথের কাঙাল। "ভিক্ষা দাও, ওগো পুরবাসী"—এই বলে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে দ্বারে দ্বারে এসে দাঁড়ালেন চিত্তরঞ্জন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমনিভাবে সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশসেবার মহান ব্রত গ্রহণ করার

দৃষ্টান্ত চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁর এই ত্যাগের মহিমা বুঝল—বিনিময়ে তারা তাঁকে 'দেশবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করল। সেই থেকে ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ তাঁর স্বজাতির হৃদয়ে 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' বা শুধু দেশবন্ধুরূপে স্থান পেলেন। মির্জাপুর পার্কের (এখনকার নাম শ্রদ্ধানন্দ পার্ক) এক বিরাট জনসভায় তাঁকে অভিনন্দিত করে বলা হোল :

"এত বড় ত্যাগ, এতখানি দেশপ্রীতি, এমন নিঃস্ব হয়ে দেশ-মাতৃকার পূজায় আহুতি দানের তুলনা বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তো নেই-ই—অন্য কোনো দেশের ইতিহাসেও আছে বলে আমাদের জানা নেই। সর্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন আজ দেশের চিত্ত জয় করেছেন—আমরা তাঁকে আজ 'দেশবন্ধু' বলে আমাদের অন্তরের অভিনন্দন জানাচ্ছি।...পরাধীন জাতির মুক্তিসাধনায় দেশবন্ধুর এই বিরাট ত্যাগ দেশকে অনুপ্রাণিত করুক।"

এই অভিনন্দনলিপি রচনা করেছিলেন তখনকার সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক, 'নায়ক'-সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। 'দেশবন্ধু' উপাধিটি তাঁরই দেওয়া। দেশের কল্যাণসাধনই ছিল চিত্তরঞ্জনের ব্রত। তাঁকে তাই এই উপাধি দেওয়া সত্যিই সার্থক হয়েছিল। কলিকাতায় এসে স্বচক্ষে সেই দেশকল্যাণব্রতী দেশবন্ধুকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে সুভাষচন্দ্রের হৃদয় সেদিন আপনা থেকেই বলে উঠেছিল—এই তো নেতা পেয়েছি।

স্কুল-কলেজ, আইন-আদালত প্রভৃতি বর্জন করা অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর অন্তর্গত ছিল। দেশবন্ধুর আহ্বানে যখন কলিকাতার কলেজগুলি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণী থেকে ছেলেরা বেরিয়ে এলো, তখন তাদের জন্য তিনি বিদ্যাপীঠ নামে একটি জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বিলাত থেকে সুভাষচন্দ্রের

তিনখানি পত্রের উত্তরে দেশবন্ধু তাঁকে ইতিপূর্বেই জানিয়েছিলেন যে, দেশে ফিরবার পর তাঁর জন্য কাজের অভাব হবে না—তাঁকে বিদ্যাপীঠের দায়িত্ব ও একখানা ইংরেজী কাগজের দায়িত্ব নিতে হবে। তাই হোল। তাঁকেই বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ করা হোল। এর প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি অধ্যাপক জে. এল. ব্যানার্জি, এই নামেই পরিচিত ; ইনি একজন সুদক্ষ সাংবাদিক ও খ্যাতনামা বক্তা ছিলেন। নানা কারণে তখন বিদ্যাপীঠে ঘোর বিশৃঙ্খলা চলছিল। অল্পদিনের মধ্যেই সুভাষচন্দ্রের অধ্যক্ষতার গুণে এখানে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। শুধু অধ্যক্ষতা করা নয়, তিনি ছাত্রদের ক্লাসও নিতেন, পড়াতেন ভূগোল, ইংরেজী আর দর্শনশাস্ত্র। বিদ্যাপীঠ কিন্তু বেশি দিন চলেনি। দেশের কাজে নেমেই সুভাষচন্দ্র খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী পরতে শুরু করেন।

দেশবন্ধুর কাছ থেকেই সুভাষচন্দ্র রাজনীতির প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন এবং যে স্বল্পকাল তাঁর সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ তাঁর হোয়েছিল, সেই সময়ের মধ্যে তিনি গুরুর রাজনৈতিক ভাবধারার অনেকখানি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। প্রথম দু'বছর গুরুর অধীনে রাজনৈতিক শিক্ষানবিশী করলেন তিনি এবং এই সময়ে যতই তিনি দেশবন্ধুর হৃদয়-মাধুর্যের পরিচয় পেতে থাকেন ততই তাঁর অন্তর গুরুর প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধায় ভরে উঠতে থাকে। কর্মী মানুষ সুভাষচন্দ্র, শুধু বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষতা করে তাঁর মন তৃপ্ত হয় না। দেশবন্ধু তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের প্রচার-সচিবের কাজও করতে বললেন। এই কাজেও সবাই তাঁর কর্মকুশলতা দেখে আশ্চর্য বোধ করে। কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁর সতীর্থদের মধ্যে অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, বিদ্যাপীঠ থাক বা উঠে যাক, "স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরাট ক্ষেত্র থেকে শিক্ষাসংসদের সংকীর্ণ প্রাচীরের মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে ধরে রাখবার কল্পনাও বাতুলতা।"

ক্রমে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর স্থান করে নিলেন এবং কংগ্রেসের সকল ব্যাপারে তিনিই হয়ে উঠলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ। কংগ্রেসের অধীনে একটি জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করে সুভাষচন্দ্র ইতিমধ্যে তাঁর সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন; তিনিই ছিলেন এর অধিনায়ক। দেশবন্ধুর আহ্বানে এবং সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় নভেম্বর মাসের মধ্যে বাঙলায় প্রায় দুই লক্ষ লোক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ১৯২১, নভেম্বর মাস। ইংলণ্ডের যুবরাজ (যিনি পরে সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডরূপে ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অভিষেকের অল্পদিন পরেই স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেন।) ভারত-সাম্রাজ্য পরিদর্শনে এলেন। কংগ্রেস থেকে নির্দেশ এলো যে ভারতবাসী কোনোরকম সংবর্ধনা জানাবে না যুবরাজকে। শাসকজাতির বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশের এই ছিল একটা উপলক্ষ্য। লর্ড রিডিং তখন বড়লাট। তাঁর টনক নড়ল। রাজপুত্র ভারত-ভ্রমণে আসবেন, ভারতবাসী তাঁকে অভ্যর্থনা করবে না—এটা তাঁর পক্ষেই লজ্জার কথা। তিনি এক হুকুম জারি করে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীকে বে-আইনী ঘোষণা করলেন। কিন্তু যুবরাজ ভারতবর্ষের যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তিনি পেয়েছিলেন বিরূপ অভ্যর্থনা। কলিকাতার বিরূপতাই ছিল সবচেয়ে বেশি। ২৪শে ডিসেম্বর যুবরাজ কলিকাতায় আসবেন। এখানে তাঁকে বয়কট করার আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর এক সতীর্থ লিখেছেন যে, এই ব্যাপারে কলিকাতা শহরে বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজনার মূলে ছিলেন তিনিই। শহরে সেদিন সম্পূর্ণ হরতাল হয়, পথে একটিও মানুষ দেখা যায়নি। ইংলণ্ডের যুবরাজকে বয়কটের সফলতা দেখে সবাই বুঝল, কি অদ্ভুতকর্মা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবক এই সুভাষচন্দ্র।

বাঙলায় তখন দেশবন্ধুর নির্দেশে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু

হয়ে গিয়েছে। এইসময়ে (১৯২১, ডিসেম্বর) সংশোধিত ফৌজদারী আইন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী দমননীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। সরকার প্রথম আঘাতেই বাঙলার স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী বে-আইনী বলে ঘোষণা করলেন। সেদিন দেশবন্ধু বলেছিলেন, "I feel the handcuffs on my wrists and the weight of iron on my body." যুবরাজ কলিকাতায় এসে পৌঁছবার পূর্বেই সরকার প্রথমে দেশবন্ধুকে আটক করেন।

এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শ্রীসাতকড়িপতি রায় তাঁর 'দেশবন্ধুর সঙ্গে পাঁচ বছর' শীর্ষক স্মৃতিকথায় লিখেছেন: "২রা কি ৩রা ডিসেম্বর মেদিনীপুর থেকে কলিকাতায় ফিরে এসে দেখি এখানে এক নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত। বীরেন শাসমল সেক্রেটারী, দেশবন্ধু প্রেসিডেণ্ট। তাঁদের নিকটবর্তী সহচরদের নিয়ে স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনীর এক নূতন কর্মপন্থা স্থির করেছেন।...সুভাষ এই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বের করবে আর তাকে সাহায্য করবে অনঙ্গ দাশ। এই বয়কট আন্দোলনে সুভাষের সংযম, সুভাষের নিয়মানুবর্তিতা, সুভাষের অকুণ্ঠ পরিশ্রম দেখেছি এবং দেখে মুগ্ধ হয়েছি।...এই আইন অমান্য আন্দোলনে প্রথম দিন দেশবন্ধুর পুত্র জেলে যাবার পর তাঁর পত্নী ( বাসন্তী দেবী ) ও ভগ্নী ( ঊর্মিলা দেবী ) জেলে যান। কলিকাতায় এমন একটা সাড়া পড়ে গেল যে সাধারণ লোকে ভাবতে লাগল—ইংরেজের শাসনপদ্ধতি বুঝি বানচাল হয়ে যায়। ১০ই কি ১১ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু জেলে গেলেন। সুভাষচন্দ্রকেও গ্রেপ্তার করা স্থির হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধেও ওয়ারেণ্ট আছে। কিন্তু সুভাষ কিছুকাল গা ঢাকা দিল আন্দোলন চালাবার জন্য। তারপর একদিন সুভাষ বলল—সে surrender করবে। মহাজনঃ যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ। দেশবন্ধু যখন জেলে গেলেন তখন তাঁর অনুসরণ করব।...তিনজন প্রধান পুরুষ জেলে গেলেন—দেশবন্ধু, শাসমল ও সুভাষ।"

সুভাষচন্দ্র ছয়মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। সুভাষচন্দ্রের জীবনে সেই প্রথম কারাদণ্ড। ছয়মাসের জেল! সুভাষচন্দ্রের মন ভরল না; কথিত আছে, আদালতে যখন তাঁকে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয় তখন তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছিলেন—"মাত্র ছ'মাস—আমি কি মুর্গী চুরি করেছি?" গুরু ও শিষ্য তুজনেই একত্রে কারাবাসে ছিলেন। এইসময়েই তিনি দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে অনেক চিন্তার আদান-প্রদান হয়েছিল এ আমরা অনায়াসেই অনুমান করতে পারি।

ফৌজদারী সংশোধন আইনে তখন হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী কারাবরণ করেছে। বড়লাট লর্ড রিডিং যুবরাজের আগমন উপলক্ষে যাতে হরতাল না হয় সেজন্য দেশবন্ধুকে অনুরোধ করতে কলিকাতায় এসেছিলেন। প্রেসিডেন্সি জেলে এই বিষয়ে আলোচনা হয়; কংগ্রেস থেকে বলা হয় যে, ফৌজদারী আইন ও রাজদ্রোহ-মূলক সভায় যোগদান করার জন্য ঐ আইনে ধৃত সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দিলে তবেই পিকেটিং ও হরতাল বন্ধ করা হবে। শেষপর্যন্ত কিন্তু এই আলোচনা ব্যর্থ হয়। দেশবন্ধু সেই সময়ে সরকারের সঙ্গে একটা যে বোঝাপড়া করার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, এই ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়। নেতারা সব জেলে, বাইরে আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগল। গ্রেফ্‌তার ও কারাদণ্ড তুই-ই সমানভাবে চলতে থাকে। কংগ্রেসী নেতাদের অনেকেই তখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। দেশবন্ধু, তাঁর একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, হেমন্ত-কুমার সরকার, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং আরো অনেকেই তখন একত্রে এখানে ছিলেন। জেলে বসে তাঁরা সকলেই রাজনৈতিক সংগ্রামের কথা আলোচনা করতেন এবং কারামুক্তির পর তাঁরা কোন্ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবেন, সে বিষয়েও পরস্পরের মধ্যে আলোচনা হোত। সুভাষচন্দ্র সেসব আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন।

"দেশবন্ধু তখন থেকেই আইন পরিষদে প্রবেশ করে সেখান থেকে এবং বাইরে থেকে কি করে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাতে পারা যায় সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাকে রূপ দেবার জন্য মনকেও প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন।" বলা বাহুল্য, তাঁর এই নূতন কার্যক্রমে সুভাষচন্দ্র খুব উৎসাহ বোধ করেন। জেলে বসেই দেশবন্ধু একখানা নিজস্ব ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশের কথাও চিন্তা করেন—নিজস্ব পত্রিকা ব্যতীত নিজেদের কথা দেশের সামনে উপস্থিত করা যায় না। তখন তাঁদের নিজস্ব কাগজ বলতে ছিল 'বাঙ্গলার কথা'। কিন্তু বাঙলা সাপ্তাহিক কাগজ দিয়ে বৃহত্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না। অন্য যেসব কাগজ তখন ছিল, সেগুলি দেশবন্ধুর বিরুদ্ধ-দলের কাগজ এবং ঐসব কাগজে দেশবন্ধুর কাযকলাপের সমর্থনে আদৌ কিছু লেখা হোত না। সেইজন্যই একখানি ইংরেজী দৈনিক কাগজের প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করলেন। এরই পরিণতি ছিল ভারত-বিখ্যাত 'ফরওয়ার্ড' ( *Forward* )।

নেতারা যখন জেলে তখন গান্ধী হঠাৎ আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। বিহারে গোরক্ষপুর জেলায় চৌরিচৌরার ঘটনাই ছিল এর প্রধান কারণ। কংগ্রেস কর্মীরা এখানে হিংসাত্মক আচরণ করেছিল এবং তারই প্রতিবাদে গান্ধী নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। ফলে অসহযোগ আন্দোলন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। জেলে বসে নেতারা এই সংবাদে যারপরনাই বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হলেন। এতদিন গান্ধী ধৃত হননি, কিন্তু যেই তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করেন অমনি কয়েক সপ্তাহ পরেই ( ১৯২২, মার্চ ) তিনি বন্দী হয়ে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কংগ্রেসের এই নীতিতে দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র দুজনেই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন : "To sound the order of retreat, just when public enthusiasm was reaching boiling

point, was nothing short of a calamity." এই প্রসঙ্গে লিস্টার হাচিনসনও তাঁর *The Empire of the Nabobs* গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

জেল থেকে বেরিয়ে বন্যাত্রাণের কাজে সুভাষচন্দ্র আত্মনিয়োগ করলেন। তখন উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যা দেখা দিয়েছে। তিনি বন্যাত্রাণ সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক সতীর্থ ও সহকর্মী লিখেছেন: "সুভাষবাবুর শরীর তখন সুস্থ নয়, তবুও সে সময়ে তিনি সেখানকার সেবার কার্য এমনভাবে পরিচালনা করেন যে সারা বাঙলাদেশে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। সুভাষচন্দ্রের সংগঠন কাজে কোনোখানে ফাঁক থাকত না। খাদ্য সরবরাহ বিভাগ, সেবা-শুশ্রূষা বিভাগ, বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে চিঠিপত্র বিলির জন্য ডাকবিভাগ, সংবাদ সংগ্রহ ও সাহায্য বিতরণ বিভাগ ইত্যাদিতে উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ সমিতির কাজে দেশবাসী সুভাষবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগল।"

আর্তের সেবায় সুনাম কিনলেন সুভাষচন্দ্র।

অতঃপর বাঙলাদেশের রাজনীতিতে তাঁর স্থান সুদৃঢ় হোল।

বন্যা রিলিফের কাজ চলেছিল ছ'মাস। তারপর কলিকাতায় ফিরে এসে আবার তিনি 'বাঙ্গলার কথা' প্রকাশ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। "হরি ঘোষ স্ট্রীটের একটি বাড়ির নীচের তলায় একটা ট্রিডল মেসিন নিয়ে 'বাঙ্গলার কথা' প্রকাশ আরম্ভ হোল—দৈনিক পত্রিকা হিসাবে। সে সময় কিছুদিনের মধ্যে এই কাগজের চাহিদা এমন বেড়ে যেতে লাগল যে হকারদের ভীড়ে ত্রস্ত হয়ে থাকতে হোত। সুভাষচন্দ্র নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাগজ বিলি করে দিতেন।"

এর পরেই আমরা সুভাষচন্দ্রকে দেখতে পাই স্বরাজ্যদল ও

'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার সংগঠনের কাজে। সে-বছর (১৯২২) গয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দেশবন্ধু। গান্ধী তখন জেলে। এই অধিবেশনেই দেশবন্ধু তাঁর আইন সভায় প্রবেশের নীতি ঘোষণা করেন ও কংগ্রেস থেকে যাতে এই নীতি সমর্থিত হয় সেজন্য আবেদন জানান। আইন পরিষদে প্রবেশ করার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে তিনি যখন কংগ্রেসমঞ্চ থেকে প্রস্তাব তুললেন তখন ঐ প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। চিত্তরঞ্জন পরাজিত হয়ে ক্ষুব্ধ হলেন কিন্তু নিরুৎসাহ হলেন না। সেখানেই তিনি 'স্বরাজ্য দল' নামে কংগ্রেসের মধ্যেই একটি নূতন দল গঠন করেন। কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। জওহরলাল নেহরুর পিতা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সেদিন দেশবন্ধুর এই প্রয়াসে সমর্থন জানিয়েছিলেন ও সহযোগিতা করেছিলেন। স্বরাজ্যদলের তিনিই ছিলেন সভাপতি।

তখন দেশে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের ফলে দ্বৈত শাসন (Diarchy) চলছে। পুরাতন দিনের কংগ্রেসের মডারেট নেতাদের অনেকেই তখন মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বাঙলার অন্যতম মন্ত্রী। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে স্বরাজ্যদল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলো। বাঙলাদেশে স্বরাজ্যদল গঠন ও দলের মুখপত্র *Forward* পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে সেদিন সুভাষচন্দ্র যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, আজ তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। এই উপলক্ষে তাঁর সংগঠনী শক্তির পরিচয় পেয়ে দেশবাসী মুগ্ধ হয়। স্বরাজ্যদলের উদ্ভব হয় ১৯২২-এর ডিসেম্বরে আর ফরওয়ার্ড পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে। প্রধান সম্পাদক—চিত্তরঞ্জন দাশ। কাগজ পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের ওপর। তিনি তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। স্বরাজ্যদল তখন সংখ্যায় পরিপুষ্ট হয়ে বাঙলা কংগ্রেসের একটি বৃহত্তর অংশ অধিকার করে

৩

বসেছে। বাঙলাদেশে সেদিন দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত, সুভাষচন্দ্র পরিচালিত এই দৈনিক ফরোয়ার্ড পত্রিকাখানি যে অভিনন্দন পেয়েছিল, ইতিপূর্বে কোনো কাগজের ভাগ্যে তা' যে ঘটেনি একথা জোর করে বলা যায়। পরিচালনার কাজ ভিন্ন, অনেক সময় সুভাষচন্দ্র কাগজের জন্য সম্পাদকীয় নিবন্ধও লিখতেন। তাঁর নিজের লেখা একটি সম্পাদকীয় খুব স্মরণীয় হয়ে আছে; সেটির নাম ছিল 'Who intimidates whom'?—'কে কাকে ভয় দেখায়'? নিবন্ধটির ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে শাসক ও শাসিতের মধ্যেকার পরস্পর বিরোধী মনোভাব ও পরাধীন জাতির প্রতি সুসভ্য ও স্বাধীন জাতির পীড়নের বর্ণনা।

এই প্রসঙ্গে তাঁর এক সহপাঠী ও বন্ধু লিখেছেন: "সুভাষচন্দ্র তাঁর নিজের কাগজ 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকায় যে নানাবিধ নূতনত্ব প্রবর্তন করেছিলেন তার জন্য আমাদের দেশের সংবাদপত্র বিশেষ-ভাবে ঋণী···ফরওয়ার্ডেই সর্বপ্রথম যেমনভাবে ঘটনাগুলি ঘটে সেগুলি ধারাবাহিকভাবে সাজানর প্রথা বর্জিত হয় এবং বক্তৃতার অথবা দৈনন্দিন ঘটনার উৎকৃষ্ট অংশগুলির প্রাধান্য দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়। সমগ্র কাগজখানির সংবাদ পরিবেশন ও মূল সুরটি যাতে দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে সে বিষয়ে সর্বদাই সতর্ক থাকা হোত।···এইভাবে সুভাষচন্দ্র সংবাদপত্রে নূতনত্বের প্রবর্তন করেন এবং তাকে জীবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তোলেন।"

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ের অনেকগুলি দিন এই পত্রিকার সঙ্গে বিজড়িত। এই কাগজের জন্য তিনি দিবারাত্র কি অমানুষিক পরিশ্রম করতেন তার চমৎকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁরই অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সুপ্রসিদ্ধ কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' নামক গ্রন্থে। ইংরেজী *Forward* ভিন্ন, ঐ একই সময়ে স্বরাজ্যদল

আরো দুখানি কাগজ বের করেছিলেন, যথা—সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' আর দৈনিক 'বাঙ্গলার কথা'। 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা সম্পাদনে আর একজনের নাম স্মর্তব্য ; তিনি বিখ্যাত দেশকর্মী ও সাংবাদিক সত্যরঞ্জন বক্সী।

বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনে স্বরাজ্যদল আশাতীতভাবে জয়লাভ করল। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদেও একটি শক্তিশালী সংখ্যালঘিষ্ঠ দল হিসাবে স্বরাজ্যদল স্থান পেল। ১৯২৪ সালেই স্বরাজ্যদলের হাতে এলো কলিকাতা পৌরসভা। এই বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে চিত্তরঞ্জন পৌরসভার প্রথম মেয়র নির্বাচিত হলেন। দেশবন্ধুর নির্দেশে এপ্রিল মাসে সুভাষচন্দ্র পৌরসভার নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভ্য নির্বাচিত হলেন এবং তিনিই এর প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত হলেন। "ঐ পদের বেতন ছিল তিন হাজার টাকা, কিন্তু সুভাষচন্দ্র দেড়হাজার টাকার বেশি গ্রহণ করতেন না এবং সে টাকাও খরচ হোত দুঃস্থ ছাত্রকর্মী ও কল্যাণকর্মে নিযুক্ত বিবিধ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে। মাত্র অল্পদিনের জন্য কর্মকর্তার পদে কাজ করবার সুযোগ পেলেও তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন" তা পৌরসভার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এইসময়ে পৌরসভার কাজ নিয়ে তিনি এমন তন্ময় থাকতেন যে, কিছুকালের জন্য তাঁকে রাজনৈতিক কর্মের ক্ষেত্রে আর দেখা যায়নি।

এইসময় পুরাতনদিনের সন্ত্রাসবাদ আবার দেখা দেয়। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে গোপীনাথ সাহা নামে এক বিপ্লবী যুবক কলিকাতার জনবহুল অঞ্চল চৌরঙ্গীতে প্রকাশ্য দিবালোকে একজন শ্বেতাঙ্গকে গুলি করে হত্যা করলেন। বিচারে তাঁর ফাঁসী হয়। মৃত্যুর পূর্বে মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় গোপীনাথ বলেছিলেন, "মা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো যেন ভারতবর্ষের মায়েরা তোমার মতোন ছেলেদের জন্ম দেন……আমার রক্তের প্রতিটি বিন্দু যেন ভারতের প্রতি গৃহে স্বাধীনতার বীজ বপন করে।" স্বরাজ্যদল

এই হিংসাত্মক কাজের নিন্দা করলেও, গোপীনাথ সাহার এই উদ্দীপনাময়ী বিবৃতি সেদিন যে সুভাষচন্দ্রকে অনেকখানি অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল, এ আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। বাঙলার বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ আছে, এই সন্দেহের ওজুহাতে ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের বলে সুভাষচন্দ্র অন্যান্য কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে ধৃত হন। "He was arrested as one of the most dangerous."—তাঁর এক ইংরেজ জীবনচরিত-লেখক এই মন্তব্য করেছেন। কিন্তু কি জন্য যে তিনি 'বিপজ্জনক' ব্যক্তি বলে সরকারের চক্ষে সেদিন গণ্য হয়েছিলেন, প্রকাশ্য বিচারে সরকার সেটা প্রমাণ করতে সক্ষম হননি। শুধু পুলিশের গুপ্ত রিপোর্টকেই তাঁরা সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।

প্রথম দু'মাস তাঁকে বিনা বিচারে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আটক রাখা হয়; তারপর কিছুদিন বহরমপুর জেলে এবং অবশেষে একেবারে সুদূর ব্রহ্মদেশে মান্দালয় জেলে সুভাষচন্দ্রকে স্থানান্তরিত করা হয়—ইন্‌সিন জেলেও কিছুদিন তিনি ছিলেন। দীর্ঘ দুটি বছর নির্বাসনে অতিবাহিত হয়। এইসময় মান্দালয় জেলে তাঁর সঙ্গে সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ আরো আটজন রাজবন্দী ছিলেন। সিমলায় বসে দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্র প্রমুখ তাঁর সহকর্মীদের গ্রেফ্‌তারের সংবাদ পান এবং অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় ফিরে এসে পৌরসভার এক বিশেষ সভায় সরকারী স্বৈরাচারের প্রতিবাদ করে যে বক্তৃতা করেন তা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বহু স্মরণীয় বক্তৃতার মধ্যে একটি। সেদিন পৌরপ্রধান হিসাবে তিনি বলেছিলেন:

"Every honest man in the country is bound to say, 'I love my country—I love my freedom, I will have the right to manage my own affairs.'

"If that is a crime, I plead guilty to that charge. If that is a crime, I am willing to be hanged for that rather than shirk my duty which I feel to be the only duty of every Indian of the present day.

"All that I want to say is that Subhas is no more a revolutionary than I am. Why have they not arrested me? I should like to know why? If love of country is a crime, I am a criminal. If Subhas is a criminal, I am a criminal. Not only the Chief Executive Officer of this Corporation but the Mayor of the Corporation is equally guilty."

সুভাষচন্দ্র প্রমুখ প্রধান কর্মীদের এইভাবে অকস্মাৎ গ্রেফ্‌তার করাতে বেশ বোঝা গেল যে, স্বৈরাচারী সরকার তখন নানাদিক দিয়ে দেশবন্ধু ও তাঁর স্বরাজ্যদলকে জব্দ করার চেষ্টা করতে ব্যস্ত। দেশবন্ধুকে কেন্দ্র করে তখন প্রকাশ্যে যে বিপুল রাজনৈতিক চেতনা এবং নেপথ্যে যে বৈপ্লবিক জাগরণ বাঙলাদেশে দেখা দিয়েছে, সরকার যেন তারই স্রোত রুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। সুভাষচন্দ্রকে গ্রেফ্‌তার করার আরো একটি কারণ ছিল। স্বরাজ্যদলের কর্তৃত্বে জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে পৌরসভা থেকে নাগরিক উন্নতি ও জনকল্যাণ সাধনের জন্য মেয়র হিসেবে দেশবন্ধু যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে সুভাষচন্দ্র সেগুলিকে কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কর্মভার গ্রহণ করেই তিনি যে কৃতিত্ব সেদিন দেখিয়েছিলেন, সেটা সরকারের মনঃপূত না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

এই অপ্রত্যাশিত দমননীতি দেশের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষের সৃষ্টি করল। এরই ফলে নৈরাশ্যে ও বেদনায় দেশবন্ধু ভেঙে পড়লেন। কর্মীরা কারারুদ্ধ, সরকারের দমননীতি সমানভাবেই চলছে; এমন অবস্থায় দেশবন্ধু নিজেকে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলেন। তিনি তাঁর প্রিয় কর্মীদের মুক্তির জন্য অস্থির হয়ে

পরলেন। এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন: "তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয় আলিপুর জেলে। তখন আমি সংবাদ পেয়েছি যে বহরমপুরে বদলি হব। বিদায়ের সময়ে আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম, 'আপনার সঙ্গে বোধহয় অনেক দিন দেখা হবে না।' তিনি উত্তরে হেসে বললেন, 'না, আমি তোমাদের বেশি দিন জেলে থাকতে দিচ্ছি না।' হায়! তখন কি আমি জানি যে আমার কথা এত বেশি সত্য হয়ে দাঁড়াবে—অদৃষ্টের কি পরিহাস।"

১৯২৫, ১৬ই জুন, মঙ্গলবার।

দার্জিলিঙ-এ দেশবন্ধুর গৌরবময় জীবনের অবসান হোল।

জীবনের প্রদীপ্ত আহুতিতে সাঙ্গ হোল তাঁর মাতৃপূজা।

দেশবন্ধুর মৃত্যুতে বিদ্রোহী-কবি নজরুল লিখেছিলেন:

"কাঁটার মৃণালে উঠেছিল ফুটে যে চিত্ত-শতদল,
শোভেছিল যাহে বাণী-কমলার রক্ত-চরণতল,
সম্ভ্রমে নত পূজারী মৃত্যু ছিঁড়িল সে শতদল—
শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য অর্পিবে বলি' নারায়ণ-পদতল।"

সজল নয়নে দেশজননী গ্রহণ করলেন এই শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য। মান্দালয় জেলে বসে সুভাষচন্দ্র পেলেন এই দুঃসংবাদ। তরুণের প্রাণ হাহাকার করে উঠল—গুরুর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাবার সুযোগ পর্যন্ত তিনি পেলেন না। এই মর্মবেদনা বুকে নিয়ে তিনি লিখলেন: "যজ্ঞের যিনি ছিলেন হোতা, ঋত্বিক, প্রধান পুরোহিত, যজ্ঞের পূর্ণ সমাপ্তির আগেই তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ভিতরের আগুন এবং বাহিরের কর্মভার—এই দুইয়ের চাপ তাঁর পার্থিব দেহ আর সহ্য করতে পারল না।"

এইসময়ে জেল থেকে সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য রাজবন্দীরা মিলিত ভাবে দেশবন্ধু-পত্নী বাসন্তী দেবীকে সমবেদনা জানিয়ে যে মর্মস্পর্শী

পত্রখানি লিখেছিলেন তার থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হোল ;
"দেশবন্ধু গিয়াছেন। যশোরশ্মিমণ্ডিত পূর্ণরবির ন্যায় তিনি জীবন-মধ্যাহ্নেই অস্ত গিয়াছেন। সিদ্ধিদাতার বরপুত্র তিনি, বিজয়মুকুট পরিয়াই ভারতের বিশাল কর্মক্ষেত্র হইতে দিব্যলোকে যাত্রা করিয়াছেন। অত্যন্ত ত্যাগের মধ্য দিয়া তিনি আজ অমৃতত্ব লাভ কয়িয়াছেন। কিন্তু আজ আমাদের বাহিরে তিমির, অন্তরে শূন্যতা।"

যাঁর মধ্যে সুভাষচন্দ্র "পিতা, সখা ও গুরুর অপূর্ব সমাবেশ" দেখতে পেয়েছিলেন, কারাগারে বসে সেই দেশবন্ধুর স্মৃতির ধ্যানেই তিনি তাঁর অন্তরের শূন্যতা ভরিয়ে তুললেন।

## ৪

১৯২৭, ১৬ই মে।

সুভাষচন্দ্র ইনসিন্, জেল থেকে মুক্তি পেলেন।

মান্দালয়ে তাঁর কারাজীবনের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ্য। "১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অন্যান্য রাজবন্দীদের সঙ্গে তিনি প্রায়োপবেশন (Hunger strike) করেন—কারণ কর্তৃপক্ষ দুর্গাপূজা প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানের জন্য ব্যয়ভার বহন করতে অস্বীকৃত হন—৪ঠা মার্চ তাঁদের দাবী পূর্ণ হওয়ার পর তাঁরা প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করেন। এই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র এক পত্রে লিখেছেন: "গভর্ণমেণ্ট আমাদের ধর্মবিষয়ে দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অতঃপর বাঙলাদেশের রাজবন্দী পূজার খরচ বাবদ বাৎসরিক ত্রিশ টাকা allowance পাইবেন। ত্রিশ টাকা অতি সামান্য এবং ইহা দ্বারা আমাদের খরচ কুলাইবে না, তবে যে principle গভর্ণমেণ্ট এতদিন স্বীকার করিতে চান নাই তাহা যে এখন স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই আমাদের সবচেয়ে বড় লাভ—টাকার কথা সর্বক্ষেত্রে সর্বকাজে অতি তুচ্ছ কথা।"

বন্দীজীবনে দুর্গাপূজা করার ইচ্ছা তাঁর হয়েছিল কেন? সুভাষচন্দ্র নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন। মেজবৌদি বিভাবতী দেবীকে এক পত্রে তিনি সেইসময় লিখেছিলেন; "কতদিন জেলে কাটাতে হবে তা জানি না। তবে বৎসরান্তে যদি মায়ের দর্শন পাই তবে সব দুঃখ সহ্য করতে পারব। দুর্গামূর্তির মধ্যে আমরা মা-স্বদেশ-বিশ্ব সমস্তই পাই। তিনি একাধারে জননী, জন্মভূমি ও বিশ্বময়ী।" শুনেছি, পূজার তিন দিন তিনি জেলের মধ্যে শুদ্ধাচারে চণ্ডীপাঠ করতেন।

ইনসিন্ সেণ্ট্রাল জেল থেকে সুভাষচন্দ্র যখন মুক্তি পেলেন তখন তিনি খুব অসুস্থ। ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লেখা এক পত্র থেকে জানা যায় যে, তখন তাঁকে চিকিৎসার জন্য রেঙ্গুনের ইনসিন্ জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁর শরীরের ওজন তখন বেশ কিছু কমেছে। বন্দী অবস্থায় সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের এই অবনতির সংবাদে তাঁর আত্মীয়স্বজন ও দেশবাসী সকলেই যারপরনাই উদ্বেগ বোধ করেন। এজন্য তাঁর ছোটদাদা ডাক্তার সুনীলচন্দ্র বসু স্বয়ং একবার রেঙ্গুনে এসে কনিষ্ঠের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। ডাঃ বসু ফিরে এসে একটি রিপোর্ট সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন; ঐ রিপোর্টে তিনি সুভাষচন্দ্রকে তাঁর হৃতস্বাস্থ্য লাভের জন্য য়ুরোপে সুইজারল্যাণ্ডে পাঠাবার প্রস্তাব করেন। সরকার ডাক্তার বসুর প্রদত্ত রোগবিবরণ গ্রহণ করলেন না, যদিও তাঁর প্রদত্ত স্বাস্থ্য অর্জন প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিলেন। এই রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুক্তির জন্য দেশের সর্বত্র নানা সভা-সমিতি হতে থাকে। মান্দালয়ে বন্দী থাকাকালীন ১৯২৬ সালের শেষভাগেই তিনি যখন বঙ্গীয় আইন সভার অন্যতম সদস্য হিসাবে মনোনীত হয়েছিলেন তখন অনেকেই এই আশা করেছিলেন যে, এইবার সরকার হয়ত তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হবেন। কিন্তু তা হয় নি। আইন-সভায় তাঁর মুক্তির জন্য দাবী করে ঐ সময়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। অবশেষে সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় যে, শর্তাধীনে তাঁরা সুভাষচন্দ্রকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত আছেন। শর্ত ছিল এই: মুক্তির পর সুভাষচন্দ্রকে স্বাস্থ্য অর্জনের জন্য বিদেশে যেতে হবে এবং অর্ডিন্যান্স আইন উঠে না যাওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ অনির্দিষ্টকালের জন্য তাঁকে বিদেশেই অবস্থান করতে হবে। এই প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে তাঁর অগ্রজ শরৎচন্দ্রকে সুভাষচন্দ্র যে সুদীর্ঘ পত্রখানি লিখেছিলেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অবশেষে ১৬ই মে সুভাষচন্দ্র বিনাশর্তে মুক্তিলাভ করলেন।

নভেম্বর মাসে তাঁর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি দেখা গেল। রাজনৈতিক কর্মের আবর্তে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তিনি ব্যগ্র হলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলেন। এই গৌরব সেদিন তাঁর প্রাপ্য ছিল। ১৯২৮ সালে সুস্থ হয়ে তিনি সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে আন্দোলন হয় তাতে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক বিকাশে পরবর্তী ধাপ কি হতে পারে, তা বিবেচনা করবার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট একটি কমিশন নিয়োগ করেন। স্যর জন সাইমন ছিলেন এর সভাপতি ; সেইজন্য ইতিহাসে ইহা 'সাইমন কমিশন' নামে খ্যাত হয়েছে। এই কমিশনে কোনো ভারতীয় সদস্য গৃহীত হয়নি, সেইজন্য কংগ্রেস থেকে ইহা বর্জন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশেষে সরকার এই কমিশনের সঙ্গে এক ভারতীয় কমিটি নিযুক্ত করেন। জাতীয় দল ইহা জাতির আত্মসম্মানের পক্ষে হানিজনক মনে করেন।

জেল থেকে বেরিয়ে সুভাষচন্দ্র বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যেসব বক্তৃতা প্রদান করেন সেগুলির মধ্যে তাঁর সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সুস্পষ্টরূপেই আভাসিত হয়েছে, দেখা যায়। তাঁর এই সময়কার বক্তৃতাগুলি যাঁরা গভীরভাবে আলোচনা করেছেন তাঁরাই জানেন কী অদম্য স্বাধীনতাস্পৃহা এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কী সুপরিকল্পিত চিন্তা সেদিন এই তরুণের মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। কংগ্রেসের বিগতদিনের প্রসিদ্ধ নেতা ও বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল ( গান্ধীর সংস্পর্শে আসবার বহু পূর্বে দেশবন্ধু স্বয়ং এঁর শিষ্য ছিলেন ) একদা বলেছিলেন : "A subject nation has no politics." এইবার সুভাষচন্দ্র বললেন—"A subject race has nothing but politics." নবীনের চিন্তার এই বলিষ্ঠতা সকলকেই মুগ্ধ করল। "পৃথিবীতে এমন কোনো ক্ষমতা নেই যা ভারতবর্ষকে আর শৃঙ্খলমুক্ত রাখতে পারে…

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত, আমরা শুধু সময়ের অপেক্ষায় আছি।" তাঁর এইসব আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ কথার মধ্যে জাতি যেন খুঁজে পেল তার নেতাকে।

বাঙলার ছাত্রসম্প্রদায়ের ওপর দৃষ্টি পড়ল সুভাষচন্দ্রের। এই-সময়ে তিনি নিখিল-বঙ্গ ছাত্রসমিতি গঠনে সচেষ্ট হন ও দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য তাদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করতে থাকেন। ব্যাপকভাবে ছাত্রসম্প্রদায় গঠনের প্রয়াস এদেশে সেই প্রথম। এইসময় তিনি নিখিল-ভারত যুবসমিতি গঠনেও যত্নবান হয়েছিলেন। ১৯২৮ সালের মে মাসে তিনি মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনের পুনা অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন। দেশবন্ধুর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী হিসাবে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রাধান্য ক্রমেই পরিলক্ষিত হতে থাকে। ১৯২৭ সালটি সুভাষচন্দ্রের জীবনে আরো একটি কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই বছর ডিসেম্বর মাসে তিনি জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে একত্রে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন।

১৯২৮।

এ-বছর কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। সভাপতি—পণ্ডিত মতিলাল নেহরু; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে, সেই বছরে পণ্ডিত মতিলাল সভাপতি হতে প্রথমে কিছুতেই রাজী ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন একজন তরুণ ঐ পদে নির্বাচিত হয়। তাঁর নিজের কথা এই ছিল: "It was time that the direction of affairs in the contry should be handed over to younger men." তাঁর ইচ্ছা ছিল, হয় বল্লভভাই প্যাটেল, না হয় পুত্র জওহরলালকে কংগ্রেস-সভাপতির পদে নির্বাচন করা হয়।

মতিলালের কথার মধ্যে যুক্তি ছিল সত্য; কিন্তু ১৯২৯ সালে দেশের রাজনৈতিক সঙ্কট আরো ঘনীভূত হওয়ার আশঙ্কার কথা তুলে এবং একটি সর্বসম্মত শাসনতন্ত্র মুশাবিদা কথার জন্য মতিলালের ন্যায় একজন প্রধান ও অভিজ্ঞ নেতার যে বিশেষ প্রয়োজন, সেই যুক্তি প্রদর্শন করে সুভাষচন্দ্র তাঁকে যখন একখানি পত্র লিখলেন তখন তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। সুভাষচন্দ্রের এই চিঠির তারিখ ১৮ই জুলাই, ১৯২৮ এবং এটা তিনি লিখেছিলেন তাঁর ১নং উড্‌বার্ণ পার্ক বাসভবন থেকে। ঐ চিঠিতে মতিলালকে তিনি আরও লিখেছিলেন: "Your close association with the work and policy of the Swaraj Party is one of several reasons for which your name is universally acceptable in this province." তাঁর মত-পরিবর্তনের পক্ষে এই যুক্তিটাও খুব প্রবল ছিল। দেশবন্ধুর স্মৃতিপূত স্বরাজ্যদল সুভাষচন্দ্রকে তখন সর্বদাই অনুপ্রাণিত করতো।

কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এত বড় অধিবেশন আর কখনো দেখা যায়নি। এই অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য ছিল এক বিরাট স্বেচ্ছা-সেবকবাহিনী এবং এর সর্বাধিনায়ক বা জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং ছিলেন সুভাষচন্দ্র স্বয়ং। তাঁর দেশবাসী দেখল সুভাষচন্দ্রের এক নূতন মূর্তি। "কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সুন্দর ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সংগঠনের মূলে ছিল সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতি অসাধারণ নিষ্ঠা। পোষাকে আসাকে চালচলনে প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবকের মনে সেদিন তিনি যে ভাব ও প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তার উৎস ছিল সুভাষচন্দ্রের নিজের অন্তরে। কে জানে আজাদ হিন্দ্‌ ফৌজ গঠনের পরিকল্পনার সূত্রপাত এইখানে কিনা?"

শুধু স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অধিনায়করূপে নয়, কংগ্রেসের এই অধিবেশনে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাই-ই

সেদিন তাঁকে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে এক অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'কংগ্রেস ও বাঙ্গলা' গ্রন্থে হেমেন্দ্র প্রসাদ লিখেছেন : "এই অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র স্বরাজের যে ব্যাখ্যা করিতে চাহিয়াছিলেন সেটা গৃহীত হয় নাই বটে কিন্তু পরবর্তী লাহোর অধিবেশনে সভাপতির আসন হইতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছিলেন!" বাঙলা প্রতিনিধিদের মুখপাত্র হয়ে সুভাষচন্দ্র সেদিন যখন "ভারতের আদর্শ পূর্ণ স্বাধীনতা"—এই প্রস্তাব উত্থাপন করলেন সেদিন কংগ্রেসের বহু প্রবীণ নেতাদের মনে বিস্ময়ের চমক লেগেছিল। এই প্রস্তাব উপলক্ষ্য করেই গান্ধীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতবিরোধের প্রথম সূত্রপাত। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল স্বতন্ত্র; গান্ধীর দাবী ছিল পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং এজন্য তিনি একবছর অপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন। সেদিন একা সুভাষচন্দ্র গান্ধীর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীর প্রস্তাবে সেদিন জওহরলাল সুভাষচন্দ্রকে প্রথমে সমর্থন করেছিলেন, কিন্তু পরে গান্ধীর অনুরোধে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধীর প্রস্তাবই গৃহীত হয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের সূচনা হোল এখান থেকেই। এই কারণে বাঙলাদেশের সমস্ত প্রতিনিধির নিকট তাঁর জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পেল। এই বছরের আর একটি ঘটনা জামসেদপুরে ইস্পাত শ্রমিকদের ধর্মঘট। সুভাষচন্দ্র এগিয়ে এলেন এবং এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরই মধ্যস্থতায় শ্রমিকদের দাবী স্বীকৃত হয় এবং ধর্মঘট মিটে যায়। তাঁর এই প্রয়াস সেদিন সর্বভারতীয় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

১৯২৯। সেপ্টেম্বর মাস।

লাহোর জেলে দীর্ঘকাল অনশনের পর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী যতীন দাশের মৃত্যু হোল। তিনি ছিলেন কলিকাতা

কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অন্যতম।) তাঁর মৃত্যুতে দেশব্যাপী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোল। লাহোর থেকে বাঙলাদেশে যতীন দাশের মৃতদেহ আনার ব্যবস্থা করলেন সুভাষচন্দ্র এবং কলিকাতায় তাঁর শবযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন তিনি। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তেমন বিরাট মিছিল এই শহরে আর দেখা যায়নি।

ভারতের মুক্তিসংগ্রামে ঘনিয়ে এলো পরবর্তী সংকট। এই বছরের অক্টোবর মাসে বিলাত থেকে ফিরে এসে বড়লাট লর্ড আরুইন ঘোষণা করলেন যে, ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে, কিন্তু তৎপূর্বে বিলাতের এক গোলটেবিল বৈঠকে এই বিষয়ে চূড়ান্ত আলোচনা হবে। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর এই বৈঠকের তারিখ নির্ধারিত হবে। কলিকাতা কংগ্রেসে ঘোষিত এক বছরের মেয়াদ তখন উত্তীর্ণপ্রায়। দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়ে চরমে উঠেছে— সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। সারাদেশে সংকটের একটা কালো ছায়া ঘনিয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করবার জন্য দেশবাসী উদগ্রীব, কিন্তু গান্ধী তখন খাদির প্রচার ও কুটীরশিল্পের প্রসার কাজে অতিমাত্রায় ব্যস্ত। এইসময় সুভাষচন্দ্র ধীরভাবে গান্ধীর এইসব অরাজনৈতিক কাজের ধারা লক্ষ্য করে মনে মনে যে অধৈর্য হচ্ছিলেন, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

এই পরিবেশেই লাহোরে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন বসল। এবার সভাপতি—জওহরলাল নেহরু। এই স্মরণীয় অধিবেশনে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষিত হয়। দাবী ঘোষিত হোল বটে, কিন্তু তারপর কি করা হবে সে বিষয়ে কোনো কার্যক্রম কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কেউ দিতে পারলেন না। "একমাত্র সুভাষচন্দ্রই সেদিন বলেছিলেন, প্যারালাল গভর্ণমেণ্ট বা প্রতিদ্বন্দ্বী সমান জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে তার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করা

হোক।" দুঃখের বিষয়, তাঁর এই বলিষ্ঠ প্রস্তাব গ্রহণ করার মতোন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব দেখা গেল কংগ্রেসের মধ্যে। সেদিন সভাপতি হিসেবে জওহরলাল সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে তাঁর ভাষণে বলেছিলেনঃ "কলিকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবানুযায়ী এখন আমাদের সম্মুখে কেবল একটিমাত্র লক্ষ্যই আছে—তাহা হইতেছে পূর্ণ স্বাধীনতা। এই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য অবিলম্বে আমাদের সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে।…ভবিষ্যতে যদি কংগ্রেস অথবা জনসাধারণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, হিংসার আশ্রয়েই আমরা আমাদের দাসত্ব মোচন করিতে সমর্থ হইব, সেদিন আমরা নিঃসন্দেহে হিংসার পথ বাছিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইব না। হিংসা মন্দ হইতে পারে কিন্তু পরাধীনতা অধিকতর মন্দ।"

সহকর্মীর এই বলিষ্ঠ কথায় সকলের চেয়ে আশ্বস্ত হলেন সুভাষচন্দ্র। সংগ্রাম! এই একটিমাত্র কথা তাঁর ধমনীতে যেন প্রবাহিত করে দিল নূতন উদ্দীপনা, আর মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলল আশা। কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতাদের মধ্যে কিন্তু তখনো পর্যন্ত রয়েছে সংগ্রাম-বিমুখতার ভাব। এখন সংগ্রামই তো দরকার, ভাবলেন সুভাষচন্দ্র, কেননা বহু-বিঘোষিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন কিংবা সর্বদলসম্মেলনে রচিত শাসনতন্ত্র—এর কোনোটাই তো আমাদের করায়ত্ত হোল না। ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে পাঞ্জাবের রাবি নদীর তীরে বর্ষশেষ ও নববর্ষারম্ভের শুভলগ্নে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হোল। সংগ্রামের সূচনার জন্য এবং এই প্রস্তাবে দেশবাসী কিভাবে সাড়া দেয় তা জানবার জন্য ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি ভারতের সর্বত্র 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপনের নির্দেশ দেওয়া হোল। এই স্বাধীনতা দিবস পালনে জনগণের মধ্যে যে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গেল, তা নেতৃবৃন্দের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করল। এ যেন বাঁধ ভেঙে অকস্মাৎ বন্যার জল দু'কূল ছাপিয়ে উঠল। গান্ধী বুঝলেন, লগ্ন উপস্থিত। লবণ

সত্যাগ্রহকে কেন্দ্র করে তিনি আবার আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবার জন্য কৃতসংকল্প হোলেন।

দেশব্যাপী এই আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৬ই মার্চ।

সরকার বুঝলেন, ১৯২১-২২ সালের আন্দোলনের চেয়ে এবারকার আন্দোলন আরো ব্যাপক হবে, কেননা দেশবাসী এখন অধিকতর সংঘবদ্ধ হয়েছে। সরকার আরো বুঝলেন আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার আগেই 'সবচেয়ে বিপজ্জনক' মানুষটিকে আটক করাই সমীচীন; ২৩শে জানুয়ারি তাঁর জন্মদিনে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেফ্তার করা হোল। তিনি একটি স্বাধীনতা মিছিল পরিচালনা করছিলেন। বিচারে তাঁর এক বৎসর কারাদণ্ড হোল। এই বছরেই তিনি নিখিল-ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত তিনি এই সংস্থার সভাপতি ছিলেন। এই বছরের আগষ্ট মাসেই সুভাষচন্দ্র রাজবন্দী অবস্থায় কলিকাতা পৌরসভার মেয়র পদে নির্বাচিত হন। এই বছরের একটি প্রধান ঘটনা—রবীন্দ্র-জয়ন্তী। কবির সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এই জয়ন্তী-উৎসবের আয়োজন হয়। উৎসবের একটি অঙ্গ ছিল প্রদর্শনী ও মেলা। সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ, বেদনাহত চিত্তে কবি তাই প্রদর্শনী ও মেলা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য উৎসব কমিটিকে নির্দেশ দিলেন। এ ছিল তাঁর সুভাষ-প্রীতির নিদর্শন।

তৃতীয়বারের মতোন সুভাষচন্দ্র কারাগারে গেলেন। যেদিন তাঁর দণ্ডাদেশ হয় সেইদিনই আলিপুর কোর্ট থেকেই এক পত্রে তিনি বাসন্তী দেবীকে লিখলেন; "আজ এক বৎসরের কারাদণ্ড আদেশ হয়েছে। বেশ আনন্দের সঙ্গে জয়যাত্রা করব রাজমন্দিরের দিকে।" এই এক বছর তিনি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলেই আবদ্ধ ছিলেন। আলিপুর জেল তখন আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদানকারী বন্দীতে ভরে গেছে; তিনি তাদের সকলের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। এইসময়ে একদিন জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বন্দীদের একটা

সংঘর্ষ হয়, সংঘর্ষের কারণ দুর্ব্যবহার। সুভাষচন্দ্র তাতে হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে প্রহৃত হন এবং এর প্রতিবাদে তিনি অনশন পর্যন্ত করেছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো তাঁর স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এক বছর পরে জেল থেকে বেরিয়ে পরবর্তী তিনমাস কাল আমরা তাঁকে নানা কার্যে ব্যাপৃত দেখতে পাই, যথা, কর্পোরেশনের কাজ, শ্রমিক সমস্যার সমাধান এবং আইন-অমান্য আন্দোলনে ধৃত বন্দীদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান।

১৯৩১। জানুয়ারি।

উত্তরবঙ্গে তখন মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলন প্রবলভাবে চলছে। সুভাষচন্দ্র ঐ অঞ্চলে যেতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। তিনি ১৪৪ ধারা অমান্য করেই উত্তরবঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। পথিমধ্যেই তিনি আটক হন ও সাতদিনের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। একটি রেল স্টেশনের বিশ্রাম-কক্ষে এই বিচার হয়েছিল। এলো ২৬শে জানুয়ারি, 'স্বাধীনতা দিবস।' সুভাষচন্দ্র তখন মেয়র; পৌরসভা থেকে এক বিরাট মিছিল বের করে তার পুরোভাগে চললেন তিনি। এই মিছিলে পুলিসের লাঠিতে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। পূর্বাহ্ণেই একজন ঊর্ধ্বতন পুলিস অফিসার তাঁকে সাবধান করে দিয়েছিলেন এবং ২৬শে জানুয়ারির অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। এর উত্তরে সুভাষচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন—"Tell your boss that I will break the law." তারপর কংগ্রেসের নীতি অনুযায়ী আদালতে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না; তবে পূর্বরাত্রে জেল-খানার হাজতে বাস করার ফলে সেখানকার অবস্থা যা তিনি প্রত্যক্ষ করেন, মেয়র হিসাবে তিনি আদালতে সেই বিষয়ে একটি বলিষ্ঠ বিবৃতি প্রদান করেছিলেন। পুলিসকোর্টের বিচারে এবার তিনি ছ'মাসের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কিন্তু গান্ধী-আরুইন চুক্তির ফলে অন্যান্য নেতৃবৃন্দসহ সুভাষচন্দ্রও শীঘ্র মুক্তি পেলেন।

৬ই মার্চ, ১৯৩১। দিল্লীতে গান্ধী-আরুইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বিলাতে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসবে, মহাত্মা গান্ধীকে এবার সেখানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের আইন-অমান্য আন্দোলন যে দেশের মধ্যে সশস্ত্র বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছিল তার বড় নিদর্শন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এবং 'সীমান্ত-গান্ধী' আবদুল গফ্‌ফর খাঁর গ্রেপ্তারের ফলে পেশোয়ারের ঘটনা। গান্ধী-আরুইন আলোচনার সময়ে সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ ছিলেন, নতুবা তিনি এই আপোষে বাধা দিতেন। নেহরু তখন গান্ধীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন; কাজেই গান্ধীর আপোষমূলক মনোবৃত্তির প্রতিবাদ করার সাহস একা সুভাষচন্দ্রেরই ছিল।

এবার কারামুক্ত হয়ে সুভাষচন্দ্র বাইরে ছিলেন মাত্র দশমাস। এই সময়কার প্রসিদ্ধ ঘটনা মেদিনীপুরের হিজলী বন্দী-নিবাসে দুইজন রাজবন্দীর মৃত্যু। তখন এখানে বহুশত বাঙালি যুবক অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর কয়েকজন বন্দীর সঙ্গে প্রহরীদের বিরোধ হয় এবং দুইজন যুবক সিপাহীর গুলিতে নিহত ও বিশজন নৃশংসভাবে প্রহৃত হন। এই ঘটনায় কলিকাতায় অত্যন্ত উত্তেজনা হয়। এই সংবাদে মর্মাহত হয়ে প্রতিবাদস্বরূপ সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রসমিতির সভাপতিত্ব ও কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান পদে ইস্তফা দিলেন। মৃত শহীদদের শবদেহ কলিকাতায় আনার ব্যবস্থা হয়। ২৬শে সেপ্টেম্বর মনুমেণ্টের তলায় লক্ষাধিক লোকের একটি জনসভা হয়। সমগ্র বাঙালি-জাতির প্রতিভূরূপে এই স্মরণীয় সভায় সভাপতিত্ব করলেন রবীন্দ্রনাথ। হিজলীর গুলি চালনা ব্যাপারটিকে তিনি "শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব" বলে ধিক্কৃত করলেন।

বিলাতে গোলটেবিল বৈঠক থেকে গান্ধী ফিরলেন শূন্য হাতে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে। লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক চলতে

থাকার সময়েই ভারত সরকার কংগ্রেসী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে দমননীতি অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। গান্ধী এর কিছুই জানতেন না। জাহাজ থেকে নেমেই গান্ধী দেখলেন নেতাদের অনেককেই ইতোমধ্যে কারারুদ্ধ করা হয়েছে—বাঙলা, যুক্তপ্রদেশ ও সীমান্তপ্রদেশ জরুরী অর্ডিন্যান্সের কবলে। তিনি বুঝলেন শান্তির আর কোনো সম্ভাবনা নেই। তখন বড়লাট লর্ড উইলিংডন। গান্ধী শেষবার চেষ্টা করবার জন্য তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন। কিন্তু সরকার ৪ঠা জানুয়ারি গান্ধীকে গ্রেপ্তার করে এর প্রত্যুত্তর দিলেন। বিচারে তাঁর দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। সুভাষচন্দ্র গিয়েছিলেন বোম্বাইতে গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে; ১রা জানুয়ারি তারিখে কল্যাণ রেল-স্টেশনে ১৮১৮ সালের তিন আইনে তিনি আবার বন্দী হলেন। এইসময়ে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। সেজন্য গ্রেপ্তার করার পর তাঁকে পরপর সিওনি, জব্বলপুর, মাদ্রাজ, ভাওয়ালী স্বাস্থ্যনিবাস ও লক্ষ্ণৌতে বলরামপুর হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। তিনি যেদিন ধৃত হন, তার ঠিক দু'দিন আগে বন্ধু দিলীপকুমারকে এক পত্রে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন: "Do you want the joy of liberty and the solace of freedom? If so, you must pay the price. And the price of liberty is suffering and sacrifice."

"স্বাধীনতার মূল্য দুঃখকষ্টভোগ ও ত্যাগ"।

সেদিনকার স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা লিপ্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে এমন আন্তরিকতার সঙ্গে এই কথা আর কেউ বলতে পারেন নি। অথবা স্বাধীনতার মূল্য দিতে সুভাষচন্দ্রের মতোন আর কেউ-ই প্রস্তুত ছিলেন না। যদি থাকতেন, তা'হলে দেশের ইতিহাস ১৯৩১-৩২ সালেই ভিন্ন রূপ ধারণ করত। ১৯৩২-এর শেষে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা গেল। মাদ্রাজে গিয়ে ডাক্তার নীলরতন সরকার ও বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে পরীক্ষা করেন। সরকারী

ডাক্তারও দু'জন উপস্থিত ছিলেন। পরীক্ষকদের রিপোর্ট জানা গেল যে, তাঁর শরীরে যক্ষ্মার লক্ষণ পাওয়া গিয়েছে এবং তাঁকে অবিলম্বে বিদেশে কোনো একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠান উচিত। অবশেষে সরকার তাঁকে চিকিৎসার জন্য য়ুরোপ পাঠালেন। ১৯৩৩-এর ২২শে ফেব্রুয়ারি তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং ১১ই মার্চ ভিয়েনাতে ডাক্তার ফার্থের ( Dr. Furth ) স্যানাটোরিয়ামে ভর্তি হন। কিছুকাল পরে এখান থেকে তিনি একটি হোটেলে চলে আসেন এবং তখন তিনি বিঠলভাই প্যাটেলের সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে আসেন।

১৯৩৩।

ভিয়েনার হোটেল দ্য ফ্রাঁসে। এইটিই শহরের মাঝখানে লাল রঙের বিখ্যাত হোটেল। ভারতের দুই নেতা—তরুণ সুভাষচন্দ্র আর বৃদ্ধ বিঠলভাই প্যাটেল ( ইনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অগ্রজ; ইনিই একসময়ে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের স্পীকার ছিলেন ) সেই সময় একসঙ্গে এখানে থাকতেন। দু'জনেই অসুস্থ। য়ুরোপের ইতিহাসে তখন হিটলারের আবির্ভাব এক তুমুল পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। সুভাষচন্দ্র গভীরভাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার অবকাশ পেলেন এইখানে। প্রবীণ প্যাটেল ও নবীন সুভাষচন্দ্র দু'জনেই বুঝলেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নেওয়ার দিন এসেছে—প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথে অগ্রসর হওয়ার দিন সমাগত। ভিয়েনায় বসে ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ধারাও তাঁরা দু'জনে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

এপ্রিল মাসে বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীর যেসব পত্র বিনিময় হয় তার থেকে বোঝা গেল যে, তাঁর মধ্যে আগেকার সেই সংগ্রামী মনোভাব আর নেই, এখন তিনি আপোষের জন্য হাত বাড়িয়েছেন।

গান্ধী তখন য়েরবাদা জেলে। জেলে বসেই তিনি ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ( Communal award ) সম্পর্কে সংবাদ পেলেন। বর্ণহিন্দু ও অনুন্নত ( তপশিলী ) হিন্দুর শ্রেণীভেদ করা হয় ঐ বাঁটোয়ারায়। হিন্দুসমাজের মধ্যে এই ভেদনীতি গান্ধী মানতে চাইলেন না এবং এর প্রতিবাদে তিনি মৃত্যুপণ অনশনব্রত গ্রহণ করেন। এ ঘটনা ১৯৩২-এর ২০শে সেপ্টেম্বর মাসের। এই অনশনের পরিণতি হরিজনদের সঙ্গে বর্ণহিন্দুদের রফা যা ইতিহাসে 'পুণা চুক্তি' নামে খ্যাত। এরপর থেকেই গান্ধী প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে অস্পৃশ্যতা নিবারণ আন্দোলনে ঝুঁকলেন। ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে গান্ধীকে তখন মুক্তি দেওয়া হয়েছে। জেলের বাইরে এসে তিনি আইন-অমান্য আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করে নিলেন। সেই সময়ে সুভাষচন্দ্র গান্ধীর এই সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করে একটি সুন্দর উক্তি করেছিলেন। বলেছিলেনঃ "Gandhiji should now be regarded as an old, useless piece of furniture."

—আন্দোলন প্রত্যাহার করা আমি আত্মসমর্পণের সামিল বলেই মনে করি। আপনার কি মত? সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন বৃদ্ধ প্যাটেলকে। উত্তরে তিনি বলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

—তবে আসুন আমরা দু'জনে মিলে একটা বিবৃতি দিই।

—বেশ কথা।

বিবৃতি রচনা করলেন সুভাষচন্দ্র। ভাবের অস্পষ্টতা নেই, ভাষার কুজ্ঝটিকা নেই। শাণিত তরবারির মতোন প্রদীপ্ত ভাষায় বিরচিত সেই বিবৃতি বৃদ্ধ প্যাটেল অনুমোদন করতে একটু ইতস্ততঃ করলেন। ভাষাটা আর একটু মোলায়েম এবং সুরটা আরো একটু নরম করা যায় না?

—না। সংগ্রামকে সংগ্রাম বলাই উচিত। আপোষ-আলোচনার ভেতর দিয়ে ইতিহাসে কোনো যথার্থ পরিবর্তন কখনো আসেনি।

("No real change in history has ever been achieved by discussion.")

—যদি বিপ্লব আসে? যদি রক্তপাত হয়?

—তাতে কিছুই যায় আসে না। স্বাধীনতালাভের জন্য রক্ত দিতে ভারতবর্ষ এখন প্রস্তুত। ("India can well afford to bring a blood sacrifice for her liberation.")

বিপ্লবী বাঙলার ঐতিহ্য আজ যেন মূর্ত হয়ে উঠল সুভাষচন্দ্রের চেতনায়। প্যাটেল আর প্রতিবাদ করতে সাহস পেলেন না। সেই ঐতিহাসিক বিবৃতির উপসংহারে সুভাষচন্দ্র লিখলেন: "The form of non-cooperation will have to be changed into a more militant one and the fight for freedom to be waged on all fronts." তারপর তিনি সেটা প্যাটেলের হাতে তুলে দিলেন এবং তিনি তাতে স্বাক্ষর করলেন। ১৯৩৩, ৯ই মে তারিখে স্বাক্ষরিত এই বোস-প্যাটেল বিবৃতি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দলিল।*

সেদিন সুভাষচন্দ্রের মধ্যে বৃদ্ধ প্যাটেল যেন নবীন ভারতের এক অশান্ত বিদ্রোহী আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "There speaks the mind of young India.... If the gods are thirsty, what can we do but offer our blood?" বোস-প্যাটেল বিবৃতির মধ্যে স্পষ্টভাবেই সেদিন ধ্বনিত হয়েছিল গান্ধী-নেতৃত্বের নিন্দা এবং ইহা প্রকাশিত হওয়ার পর সকলের মনে এই ধারণা হয় যে, এইবার কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের দিন এসেছে—এইবার একজন নূতন নেতার প্রয়োজন।

* এই ঘটনাটির সাক্ষী ছিলেন আলফ্রেড টায়ার্নর নামে একজন মার্কিন সাংবাদিক। ১৯৪৪, ১১ই মার্চ তারিখের *Saturday Evening Post* পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

নভেম্বর, ১৯৩৪।

তখন সবেমাত্র 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্' বইখানা প্রকাশ করেছেন সুভাষচন্দ্র. এমন সময়ে একদিন নভেম্বরের শেষাশেষি মায়ের কাছ থেকে টেলিগ্রাম এলো পিতার অসুস্থতার দুঃসংবাদ বহন করে। পিতার সংকটজনক পীড়ার সংবাদে তিনি যারপরনাই বিচলিত বোধ করলেন। তিনি চিরদিন পিতৃ-মাতৃভক্ত সন্তান। বিশেষ করে পিতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার সীমা-পরিসীমা ছিল না। তাঁরই জন্য জানকীনাথকে চিরকাল উদ্বেগ ভোগ করতে হয়েছে, এজন্য সুভাষচন্দ্রের মনে অনুশোচনার অন্ত ছিল না। তাঁর অনেক চিঠির মধ্যে এর ইঙ্গিত আছে। আজ তাই অসুস্থ পিতাকে দেখার জন্য তিনি অস্থির হলেন। গভর্ণমেণ্টের বিনা অনুমতিতেই য়ুরোপ ত্যাগ করে তিনি ভারতবর্ষ অভিমুখে রওনা হলেন। ৩রা ডিসেম্বর করাচী পৌঁছে সংবাদ পেলেন আগের দিন তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছে। দমদম বিমানঘাঁটিতেই তাঁর প্রতি অন্তরীণের আদেশ দেওয়া হয়—সেই সঙ্গে আয়ো একটি আদেশ দেওয়া হোল যে, সাতদিনের মধ্যেই তাঁকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু পরে তাঁকে পিতৃশ্রাদ্ধ পর্যন্ত কলিকাতায় থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। শ্রাদ্ধাদি শেষ হওয়ার পর ১৯৩৫, ১০ই জানুয়ারি তিনি আবার চিকিৎসার জন্য য়ুরোপে চলে যান। এসেছিলেন বিমানে, ফিরে গেলেন জাহাজে।

সুভাষচন্দ্রের *The Indian Struggle* বা 'ভারতীয় সংগ্রাম' বইখানি লণ্ডনের এক পুস্তক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে। ভারতবর্ষে এই বইয়ের প্রবেশ দীর্ঘকাল যাবৎ নিষিদ্ধ ছিল। ইহা সুভাষচন্দ্রের আত্মচরিত, কিন্তু নেহরুর আত্মচরিতের মতোন তাঁর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবনের

কাহিনী এই বইতে স্থান পায়নি। এ বই যথার্থই ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস। সেই পলাশির যুদ্ধের পর থেকে এই দীর্ঘকাল বন্ধনে-বেদনায় ভারতের আত্মা মুক্তির জন্য কিভাবে ব্যগ্র হয়েছে, তারই বস্তুনিষ্ঠ কাহিনী এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। সুভাষচন্দ্র নিজের কথা বিশেষ কিছুই বলেন নি—তিনি শুধু ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের গতি-প্রকৃতি অনুসরণ করে এই সংগ্রামে কংগ্রেসের ভূমিকা কি, তা অনুধাবন করে কতকগুলি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। গান্ধীর দুর্বলনেতৃত্ব ও তাঁর আপোষমূলক মনোভাবের এমন বিশ্লেষণ ইতিপূর্বে আর কেউ করতে পারেন নি। এই হিসাবে সুভাষচন্দ্রের বইখানির একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে এবং সে দিন ইহা রচনা করা ও প্রকাশ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ভারতে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণেই বইখানি প্রকাশিত হয়; কেননা এর এক বছর পরেই এমন একটি নূতন শাসনতন্ত্র এই দেশে প্রবর্তিত হয় যাকে নেহরু স্বয়ং 'Charter of slavery' বা 'দাসত্বের সনদ' বলে সেদিন অভিহিত করেছিলেন। উনিশটি অধ্যায়ে সমাপ্ত 'ভারতীয় সংগ্রাম' সুভাষচন্দ্রের সুপরিণত রাজনৈতিক চিন্তার ফল হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। একখানি বই তিনি গান্ধীর কাছেও পাঠিয়েছিলেন।

এখানে একটি কথা উল্লেখ্য। জওহরলালও তাঁর আত্মজীবনী লেখা শেষ করেন ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং বইখানি প্রকাশিত হয় লণ্ডন থেকে ১৯৩৬ সালের জানুয়ারি মাসে। একই সঙ্গে সুভাষচন্দ্র ও নেহরুর বই প্রকাশিত হওয়ার ফলে ভারতের পরবর্তী রাজনীতিতে তা যে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নেহরুর মানস-জীবনের, বিশেষ করে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস হোল তাঁর আত্মচরিত; অন্যদিকে সুভাষচন্দ্রের 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' হোল তাঁর স্বাধীনতাবোধের বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি; নেহরুর মতোন

সুভাষচন্দ্রের মানস-জীবনও মানব-সভ্যতার ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিবর্তন ধারার ঐতিহাসিক চেতনায় অনুরঞ্জিত। কি ঐতিহাসিক বোধ ও উচ্চ আদর্শবাদ থেকে সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা স্পৃহা, তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সর্বোপরি তাঁর আন্তর্জাতিক মনোভাব গড়ে উঠেছিল তা বুঝতে হলে এই বইখানি অবশ্যই পাঠ করতে হয়। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের আলোচনা কাল ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত; এর দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনা কাল হোল ১৯৩৫ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত। ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে তিনি যখন জার্মানিতে অবস্থান করে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সংগঠনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন সেই সময়ে কিছুদিনের জন্য অস্ট্রিয়ার বাদগাস্টিনে বসে গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঐ কাজ শেষ করেন। গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বেরুবামাত্র এককপি তিনি জওহরলালকে পাঠিয়েছিলেন ও তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। জার্মানির হফগাসটিন নামক স্থান থেকে ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৫ তারিখে নেহরুকে লেখা সুভাষচন্দ্রের এক চিঠি থেকে জানা যায় যে, নেহরু তাঁর বই সম্পূর্ণ পাঠ করেছিলেন এবং সন-তারিখ সম্পর্কে কয়েকটি ভুল-ভ্রান্তির কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন। সুদূর বিদেশে যে অবস্থার মধ্যে এই গ্রন্থ রচিত হয়, তাতে এটা স্বাভাবিক ছিল।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক প্রতিভার এই অবিনশ্বর কীর্তির সঙ্গে এক বিদেশিনী মহিলার নাম জড়িত আছে। তিনি শ্রীমতী শেঙ্কেল (Fraulein E. Schenkl); এই গ্রন্থরচনায় তাঁর সাহায্যের কথা গ্রন্থের ভূমিকায় সুভাষচন্দ্র সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেছেন। ভিয়েনাতেই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় এবং সেই পরিচয় শেষে দাম্পত্যবন্ধনে পরিণত হয়েছিল। সেই ইতিহাস সুবিদিত।

বলেছি, য়ুরোপে অবস্থানকালে সুভাষচন্দ্র যেমন গভীর মনোযোগ সহকারে সেখানকার ঝটিকাবিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তেমনি ভারতের স্বপক্ষে অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সহানুভূতি জাগিয়ে তোলার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করলেন তিনি। তিনি আরো বুঝলেন যে, ভারতের অনুকূলে উদ্রিক্ত আন্তর্জাতিক অভিমত ভিন্ন ভারত সাম্রাজ্যের উপর ব্রিটিশের দৃঢ়-মুষ্টিকে কিছুতেই শিথিল করা যাবে না। এই উদ্দেশ্যে তিনি এই সময় তাঁর লেখনী অশ্রান্তভাবে পরিচালনা করেছিলেন। য়ুরোপ-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের তিনি বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিতেন যে তারা যেন কখনো ভুলে না যায় যে, তারাই ভারতের প্রকৃত রাষ্ট্রদূত এবং তিনি একটি ছাত্রসমিতিও গড়ে তুলেছিলেন। এই সমিতি মারফৎ তিনি য়ুরোপ-প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে যথেষ্ট প্রচার কার্য চালিয়েছিলেন। এছাড়া যখনই পারতেন সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তৎকালীন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ্ এবং রাষ্ট্র-প্রধানদের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করেছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে ভারতবর্ষের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ডাঃ বেনিস, মুস্তাফা কামাল পাশা, ডি ভ্যালেরা, রোমাঁ রোলাঁ, হিটলার, রিবেনট্রপ, মুসোলিনী প্রভৃতি অনেকেই ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের আন্তরিকতায় তাঁর প্রতি যারপরনাই শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন। একবার নাৎসী-অধিনায়ক হিটলারকে তিনি বলেছিলেন; "Britain is our traditional enemy. We will fight her, whether you support us or not." এইভাবে বার্লিন, রোম, প্রাহা, ওয়ারশ, ইস্তাম্বুল, বেলগ্রেড, বুখারেস্ট প্রভৃতি স্থান একাধিকবার পরিভ্রমণ করে সুভাষচন্দ্র যখন ১৯৩৬ সালের মার্চমাসে দেশে ফিরলেন তখন তাঁর মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে, য়ুরোপে যুদ্ধ আসন্ন। তাঁর স্বাস্থ্যের তখন অনেকখানি উন্নতি হয়েছে।

ইতোমধ্যে গান্ধী সক্রিয় রাজনীতি থেকে অনেকখানি সরে

গিয়েছেন এবং গ্রামোন্নয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। অনেক কংগ্রেস নেতাও তাঁর সঙ্গে এই কাজে যোগদান করেছেন। ১৯৩৫-এর শাসন-সংস্কার আইনে পরিণত হয়েছে। নির্বাচন আসন্ন। কংগ্রেস নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে ঠিক করেছে এবং অতঃপর শাসনতান্ত্রিক পথেই সে অগ্রসর হবে। ১৯৩৬ সালের রাজনৈতিক ভারতবর্ষের একাংশ তখন সদ্য মোহভঙ্গের ফলে অবসাদগ্রস্ত ও হতবুদ্ধি। দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অসংখ্য দেশকর্মী কারাবরণ করেছেন, শাসকবর্গের অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করেছেন। তাঁরা দেখলেন, আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল। এই অবস্থায় ভারতবর্ষে নবগঠিত সমাজতন্ত্রীদল তখন আগের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তথাপি দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া সেদিন আত্মকলহ ও পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহে দূষিত হয়ে উঠেছিল।

নববৎসরের প্রারম্ভেই সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বেন ঠিক করলেন। জওহরলাল তখন নূতন কংগ্রেস সভাপতি সাব্যস্ত হয়েছেন—তিনিই সুভাষচন্দ্রকে দেশে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ জানালেন। সুভাষচন্দ্র তখন অস্ট্রিয়ার বাদগাস্টিনে ছিলেন। মার্চ মাসে যখন তিনি তাঁর প্রত্যাবর্তনের সংকল্প ঘোষণা করেন তখন একদিন সুভাষচন্দ্র ভিয়েনাস্থ ব্রিটিশ কনসাল মারফৎ ভারতসচিবের কাছ থেকে এই মর্মে এক সতর্কবাণী পেলেন যে, দেশে ফিরলেই তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। "You cannot expect to remain at liberty"—ব্রিটিশ কনসালের চিঠির শেষে ভারতসরকারের এই উদ্ধত নির্দেশ সুভাষচন্দ্রকে এতটুকু বিচলিত করল না। পরম ঘৃণার সঙ্গে তিনি উপেক্ষা করলেন এই সতর্কবাণী।

এইসময়ে য়ুরোপ পরিত্যাগের প্রাক্কালে এক সুদীর্ঘ পত্রে তিনি জওহরলালকে এই সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা সম্পর্কে যে সব কথা লিখেছিলেন সেগুলির ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে দেশে

ফিরবার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা। এই চিঠির তারিখ ১৩ই মার্চ, ১৯৩৬। ঐ পত্রে তিনি লিখেছেন: "এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছা যে আমি এই আদেশ অমান্য করে দেশে ফিরে যাই। তুমি আমাকে কি পরামর্শ দাও? তোমাকে এই বিষয়ে চিঠি লিখবার কারণ এই যে, তুমি ছাড়া আমার বিশ্বাসের পাত্র এখন আর কেউ নেই। আর সময় এত কম যে, এই ব্যাপারে অনেকের কাছ থেকে উপদেশ চেয়ে পাঠানো অসম্ভব।...এখন দেশে ফিরে যাওয়া মানেই কারাবরণ। অবশ্য—going to prison has its public utility and there is much to be said in favour of defying an official order like this."

সুভাষচন্দ্রের যে সংকল্প সেই কাজ।

৮ই এপ্রিল, ১৯৩৬।

সুভাষচন্দ্র বোম্বাইতে পৌঁছলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ১৮১৮ সালের ৩ আইনে গ্রেফ্‌তার করা হয়। তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের উদ্দেশ করে সুভাষচন্দ্র বললেন—"Keep the flag of India's freedom flying." সুভাষচন্দ্রের গ্রেফ্‌তারে এদেশে এবং ইংলণ্ডে তুমুল প্রতিবাদ উঠল, কিন্তু বৃথা। তবে এবার আটক করে তাঁকে কোনো জেলে রাখা হয়নি। কিছুকাল দার্জিলিঙ-এ রাখার পর কার্শিয়াং-এ তাঁর মধ্যম অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর গৃহে অন্তরীণ রাখা হয়েছিল।

১৯৩৫ সালের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে তাঁর সতীর্থ জওহরলাল দ্বিতীয়-বারের জন্য সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঐসময়টা ছিল খুব সংকটজনক। কাজেই কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে জওহরলালকে তখন খুব পরিশ্রম করতে হোত। তখন অল্প কিছুদিন হয় য়ুরোপে তাঁর জীবনসঙ্গিনী কমলার মৃত্যু হয়েছে, তার উপর কংগ্রেসের চাপ। স্বভাবতই সুভাষচন্দ্র তাঁর জন্য উদ্বেগ বোধ করেন এবং বন্দী অবস্থায় দার্জিলিঙ

থেকে তিনি এই সময়ে জওহরলালকে যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তার মধ্যে তাঁর হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি অভিব্যক্ত হয়েছে। এই চিঠির তারিখ ৩০শে জুন, ১৯৩৬। জওহরলাল তখন স্বল্পকাল বিশ্রামের জন্য মুসৌরী এসেছেন। সেই পত্রের একস্থানে সুভাষচন্দ্র লিখছেন: "I do hope that you will not strain yourself too much. It will not help any one if you have a breakdown." এই চিঠির শেষাংশে জওহরলালের কাছ থেকে পড়বার জন্য তিনি কয়েকখানি বই চেয়ে পাঠান—পৃথিবীর সমসাময়িক কালের সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ইতিহাস-সংক্রান্ত বই। এই তালিকার মধ্যে র‍্যালফ ফক্স প্রণীত ও সদ্য প্রকাশিত 'চেঙ্গিস খান' বইখানির নামেরও উল্লেখ ছিল। বন্দীজীবনেই তিনি অধ্যয়নের অবসর পেতেন এবং সেই সময়ে বই পড়তেনও প্রচুর। রাজনীতি ও ইতিহাস সংক্রান্ত বই-ই তাঁর প্রিয় ছিল।

১৭ই মার্চ, ১৯৩৭।

সুভাষচন্দ্র বিনাশর্তে মুক্তি পেলেন।

১৯৩৫-এর আইন অনুসারে অনুষ্ঠিত সদ্য নির্বাচনদ্বন্দ্বে কংগ্রেস জয়লাভ করেছে এবং সাতটি প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সুভাষচন্দ্র এই বিষয়ে কোনো উৎসাহ প্রকাশ করলেন না বা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তে কোনো অংশ গ্রহণ করলেন না। তিনি পাঞ্জাবের সিমলা পাহাড়ে অবকাশযাপনের জন্য চলে গেলেন। এখানে তিনি অক্টোবর মাস পর্যন্ত ডাক্তার ধরমবীর ও তাঁর পত্নীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। জওহরলাল এরই মধ্যে দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন ( ১৯২৯ ও ১৯৩৬ ), সুভাষচন্দ্র একবারও হননি, অথচ সেই সময়ে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে নবোদিত সূর্যের মতো তাঁর দীপ্যমান জনপ্রিয়তা দেখে গান্ধী স্বয়ং বিস্মিত হলেন। নানা প্রাদেশিক কংগ্রেস থেকে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে সভাপতি করার জন্য গান্ধীর কাছে

প্রস্তাব আসতে লাগল। গান্ধী জানতেন জওহরলাল তাঁর অনুগত বলেই তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার পেয়েছেন; অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বিদ্রোহী—তাঁকে স্বমতে আনা তাঁর সাধ্যে কুলায়নি। তথাপি, গান্ধী চিন্তা করলেন, তাঁকে যদি কংগ্রেসের সভাপতি করা যায়, হয়ত এই বিদ্রোহী বশ্যতা স্বীকার করে জওহরলালের মতোনই তাঁর অনুগত হবেন। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাস ইহাই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এ ছিল গান্ধীর দুরাশা। স্বমত-প্রধান ব্যক্তি সুভাষচন্দ্রের পক্ষে কারো বশ্যতা স্বীকার করা বা কারো অনুগত হয়ে চলা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

যাইহোক, ড্যালহৌসীতে থাকার সময়েই সুভাষচন্দ্র ও গান্ধীর মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়েছিল তারই মধ্যে তাঁকে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে সভাপতি করার আভাস ছিল। তারপর কলিকাতায় ফিরে তিনি কয়েকটি বৈঠকে গান্ধীর সঙ্গে মিলিত হন এবং ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতিত্বের জন্য মনোনয়ন গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। এরপরই তিনি য়ুরোপ যাত্রা করেন এবং ছয় সপ্তাহকাল বাদগাস্টিনে অতিবাহিত করে তিনি ১৯৩৮ জানুয়ারিতে কিছুদিনের জন্য ইংলণ্ডে অবস্থান করেন। লণ্ডনে তিনি মিস্টার য়্যাটলি, মিস্টার আর্নেস্ট বেভিন ও স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস কর্তৃক অভ্যর্থিত হয়েছিলেন। লণ্ডন থেকে তিনি জানুয়ারির শেষভাগে কলিকাতায় ফিরলেন।

১৯৩৮।

সুভাষচন্দ্রের জীবনে তথা ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। তিনি তখন জনপ্রিয়তার শিখরে যখন তিনি কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচিত হলেন। তিনিই কংগ্রেসের প্রথম বিদ্রোহী সভাপতি। তখন তাঁর বয়স একচল্লিশ বছর।

হিউগ টয় লিখেছেন : "Bose was now a man of more than national stature. Abroad he ranked after Gandhi and Jawaharlal Nehru as an Indian politician. Within India his personality proved to many the most attractive of the three. In some places his reputation rivalled that of Gandhi himself, and his nomination as President of the Congress at the early age of forty one was without doubt an attempt by the Mahatma to consolidate with the orthodox Congress those considerable left-wing elements, in Bengal and elsewhere, which actually prefered Bose's leadership."

দেশ সত্যিই তখন সুভাষচন্দ্র বসুর মতোন একজন মনে-প্রাণে সংগ্রামী নেতার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব কামনা করছিল। সেই ১৯২১ সাল থেকে তিনি কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত আছেন এবং গান্ধী-প্রমুখ দক্ষিণ পন্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আদর্শ ও কর্মপন্থা নিয়ে বারবার তাঁর মতবিরোধ হয়েছে। গান্ধীর অহিংসনীতির সারবত্তা তিনি কোনোদিনই বুঝতে পারেন নি। তিনি বারবার বলেছেন: "While the country was ready, the leaders were not." দশ বছর আগে অর্থাৎ ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী কমিটির এক অধিবেশনে তিনি প্রকাশ্যেই বলেছিলেন —"What we feel most acutely is that at a most critical juncture in our history our older leaders have failed to rise to the occasion." দীর্ঘকাল যাবৎ কংগ্রেস তথা গান্ধী-নেতৃত্বের গতি ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে সুভাষচন্দ্রের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছিল যে, "The entire intellect of the Congress has been mortgaged to one man." ১৯১৯ সাল পর্যন্ত দেখা যায় যে, জওহরলাল পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের অভিমতই পোষণ করতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান্ধীর

সম্মোহনী প্রভাবের ফলে ভারতের রাজনীতিতে সমাজতন্ত্রী নেহরুর মৃত্যু ঘটেছিল। একা সুভাষচন্দ্রকেই সেদিন গান্ধীর বিরোধিতা করতে হয়েছিল।

১৯৩৭ সালে সুভাষচন্দ্র দেখলেন গান্ধী তাঁর বিলুপ্তপ্রায় নেতৃত্ব অনেকখানি পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন এবং সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার দরুণ দলের উপর তাঁর প্রভাব আগের চেয়ে অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ ঐগুলির উপর তাঁরই ছিল ষোলআনা নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা। তেমনি গান্ধীও এইবার যেন উপলব্ধি করলেন যে, সুভাষচন্দ্রকে আর উপেক্ষা করা চলে না। কংগ্রেসের তরুণ ও বামপন্থী সদস্যদের মধ্যে তাঁর প্রভাব সুস্পষ্ট এবং দেশের একটি বৃহৎ অংশ যেন তাঁরই নেতৃত্ব কামনা করছে। এই অবস্থাতেই যখন কলিকাতায় উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎকার হয় তখন আলোচনার বিষয় ছিল—উভয়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন। নূতন শাসনসংস্কারে কংগ্রেসকর্তৃক মন্ত্রীত্ব গ্রহণে সুভাষচন্দ্রের প্রবল আপত্তি ছিল। আপত্তির কারণঃ যে স্বল্পক্ষমতা তাঁরা লাভ করেছেন তার ফলে মন্ত্রীত্ব ও কংগ্রেস উভয়ের মধ্যেই দুর্নীতি প্রবেশ করার সম্ভাবনা আছে। দেশশাসনেই তাঁদের ক্ষমতা নিঃশেষিত হবে, বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতা অর্জনে তাঁদের প্রয়াস স্বভাবতই শিথিল হয়ে আসবে। সুভাষচন্দ্রের মূল বক্তব্য ছিল এই যেঃ "It was a mistake to accept office until the fight was won."

কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার পর সুভাষচন্দ্র যখন তাঁর প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেস-সভাপতি হতে স্বীকৃত হলেন তখন তাঁর মনের মধ্যে এই চিন্তাই প্রবল হয়েছিল যে, য়ুরোপে যখন যুদ্ধ আসন্ন তখন কংগ্রেসের মধ্যে কোনো রকম বিরোধ থাকা উচিত নয়। তা'ছাড়া, গান্ধীর সঙ্গে একটি বিষয় তিনি একমত ছিলেন যে, নূতন শাসনতন্ত্রে প্রস্তাবিত Federation বা যুক্তরাষ্ট্র যদি

প্রবর্তিত হয় তা'হলে দেশশাসনের প্রকৃত ক্ষমতা ব্রিটিশের হাতেই থাকবে—এই প্রস্তাব বর্জন করতেই হবে এবং তা করতে হলে ঐক্যের প্রয়োজন। ঐক্য ভিন্ন প্রকৃত স্বাধীনতা কোথায়? এইসব নানাবিধ চিন্তার ফলেই সুভাষচন্দ্র গান্ধীর অনুরোধে কংগ্রেসের কর্ণধার হতে সম্মত হয়েছিলেন।

১৯৩৮। ১৯শে ফেব্রুয়ারি।

হরিপুরায় কংগ্রেসের ৫১তম অধিবেশন বসল। এবার সভাপতি—সুভাষচন্দ্র বসু। প্রকৃতপক্ষে ইহাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক অভিষেক। একান্নটি বলদ-বাহিত যানে একান্নটি তোরণের তলা দিয়ে চললেন কংগ্রেস-সভাপতি। দুইধারে দাঁড়িয়ে অগণিত জনতা ভারতের জাতীয় সংগ্রামের নবীন নেতাকে জানাল তাদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন। নানাদিক দিয়েই হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণ ছিল উল্লেখযোগ্য। সমগ্র কংগ্রেস-নীতি তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করলেন। ভাষণের গোড়াতেই তিনি স্বরূপরাণী নেহরু, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু এবং ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। বাঙলার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রতি ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। তিনি শুধু ঔপন্যাসিক ছিলেন না, ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক ও কংগ্রেস-সেবক। সুভাষচন্দ্রও শরৎচন্দ্রের পরম স্নেহের পাত্র ছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর মাসিক বসুমতীতে শরৎচন্দ্রের 'স্মৃতি কথা' পাঠ করে বিমুগ্ধ চিত্তে সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেল থেকে তাঁকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন তা স্মরণীয় হয়ে আছে।

এই ভাষণে তিনি দেশের মুক্তিসংগ্রামে কংগ্রেস তথা গান্ধীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন: "আজকের

জনসংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হোল কংগ্রেস। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে দেশের সমস্ত লোকের সমবেত হওয়া উচিত···ভারতের স্বাধীনতার জন্য, ভারতের ঐক্যের জন্য মহাত্মা-গান্ধীর নেতৃত্বের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।” সবশেষে তিনি বললেন: “আমাদের এই সংগ্রাম কেবলমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়—পৃথিবীর সমস্ত সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ করাই হোল আমাদের লক্ষ্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এরই মূলাধার। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্য নয় পৃথিবীর সমগ্র মানবতার মুক্তির জন্য আমাদের এই সংগ্রাম। কারণ আমি বিশ্বাস করি—ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়া মানেই পৃথিবীর অন্যান্য পরাধীন মনুষ্যজাতির মুক্তি।”

রাজেন্দ্রপ্রসাদ ( ১৯৩২ সালে বোম্বাই কংগ্রেসের ইনি সভাপতি ছিলেন। ) তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন। “সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হরিপুরা কংগ্রেসে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল।” এই উদ্দীপনাব হেতু ? হেতু সুভাষচন্দ্র স্বয়ং। কংগ্রেসের মধ্যে তখন প্রবল দলাদলি ; দলীয় প্রাধান্যের কাছে তখন দেশের বৃহত্তর স্বার্থ একরকম তুচ্ছ হয়ে যেতে বসেছে। দেশে কোনো আন্দোলন নেই, আন্দোলন করার ইচ্ছাও নেই নেতাদের। মন্ত্রীত্ব গঠন করে কংগ্রেসের একাংশ তখন আন্দোলন থেকে দূরে সরে গিয়েছে। স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে—এই ইচ্ছাটা পর্যন্ত জাতি হারিয়ে বসেছে। নেতাদের মধ্যে সংগ্রামী মনোভাবের পরিবর্তে শাসকজাতির সঙ্গে আপোষ করার আগ্রহটা যেন তখন ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছিল। এই পরিবেশে সভাপতির পদে সুভাষচন্দ্রের নির্বাচন স্বভাবতই উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি এখন সুভাষচন্দ্রের ওপর।

কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে ভারতের শাসক সম্প্রদায় প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারলেন না ; নব-প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রের তিনি ছিলেন প্রবল বিরোধী। বৈপ্লবিক ভাবধারায় কংগ্রেসের পুরানো

কাঠামোকে ভেঙে নূতন করে গড়বার যে স্বপ্ন তিনি আজীবন দেখে এসেছেন, ভিয়েনার হোটেলে বসে যার পরিকল্পনা তিনি রচনা করেছিলেন, এতদিনে সেই স্বপ্ন সফল করার সুযোগ পেলেন তিনি কংগ্রেসের কর্ণধার হয়ে। ঝটিকার বেগে তিনি ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে জাতির অন্তরে নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করতে লাগলেন। কৃষক, মজুর, বামপন্থী—সকল দলের কর্মীকে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত ও সংহত হওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে 'রাষ্ট্রপতি' নামে অভিহিত করা হোত। পরাধীনতার মর্মজ্বালা বুকে নিয়ে তিনি সকলকে সংগ্রামশীল হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। বিস্ময়কর সংগঠনী শক্তি নিয়ে তিনি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে লাগলেন। ইংরেজের মনে ত্রাসের সঞ্চার হোল। গান্ধী ও অন্যান্য দক্ষিণপন্থী নেতারা উদ্বিগ্ন হলেন। গান্ধীর বিশ্বাস ছিল যে, সুভাষচন্দ্রের অন্তরের বৈপ্লবিক আগুনকে তিনি অহিংসার জল ছিটিয়ে নিভিয়ে ফেলতে পারবেন। কিন্তু তিনি ভুল করেছিলেন। গান্ধী-সুভাষ ঐক্য তাই আগের মতোনই সংকটজনক হয়ে রইল এবং ১৯৩৮ সাল যতই শেষ হয়ে আসতে লাগল ততই উভয়ের মধ্যে আদর্শগত ব্যবধান বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৩৯।

বিশ্ব-ইতিহাসের একটি অবিস্মরণীয় বৎসর।

এইসময়কার য়ুরোপের অবস্থা সাক্ষাৎভাবে পর্যবেক্ষণ করে জওহরলাল তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন "There was gloom there and the apparent stillness that comes before the storm," আর সুভাষচন্দ্র তো স্পষ্টই উপলব্ধি করলেন যে, এই বছরটি অত্যন্ত সংকটজনক হবে—য়ুরোপে যুদ্ধ সুনিশ্চিত। "ইংলণ্ডের বিপদ কংগ্রেসের সুবর্ণ সুযোগ"—এই উক্তিটি তিনি এই

সময়ে বহু জনসভার করতেন। বলতেন—এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার জন্য ভারতবাসীকে প্রস্তুত থাকতে হবে। গান্ধী বা গান্ধী-অনুগামী নেতাদের কেউ-ই যে এই সুযোগ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত নন—সুভাষচন্দ্রের তা বুঝতে বিলম্ব হয়নি। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা তখন ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছেন ; আর 'হাই কম্যাণ্ড'—যাঁরা তাঁদের ওপর মুরুব্বিয়ানা করছেন—পরম উদাসীনতার মধ্যে তখন সমাহিত হয়ে রাজনৈতিক রোমন্থনে দিনাতিপাত করতে ব্যস্ত এবং তাঁদের অনেকেই তখন যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের পক্ষে আপোষ করতেও উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

এই পটভূমিকায় সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ঠিক করলেন। বলা বাহুল্য, গান্ধী বা হাই কম্যাণ্ড—কারো এতে সমর্থন ছিল না। মার্চ মাসে জব্বলপুরের নিকটবর্তী ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন হওয়ার কথা। অনেকের ইচ্ছা ছিল এইবার মৌলানা আজাদ সভাপতি হন, আবার অনেকে দ্বিতীয়বারের জন্য সুভাষচন্দ্রকেই সভাপতি করবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করলেন। আজাদ কিন্তু নির্বাচনে দাঁড়াতে সম্মত হলেন না। সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হবেন—ইহাই কংগ্রেসের চিরাচরিত ধারা। কিন্তু আজ এই কথা বলার দিন এসেছে যে, সেদিন সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামী নেতৃত্বে ভীত হয়ে গান্ধী এবং গান্ধীর নির্দেশে ওয়ার্কিং কমিটি সুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয়বারের জন্য মনোনয়ন দিতে অসম্মত হলেন। মৌলানা আজাদ যখন রাজী হলেন না তখন সর্দার প্যাটেল মাদ্রাজের অজ্ঞাতনামা কংগ্রেসকর্মী পট্টভি সীতারামাইয়ার নাম প্রস্তাব করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকেই মনোনয়ন দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্র প্যাটেলের এই 'চালেঞ্জ' গ্রহণ করে নির্বাচনীদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়ে গান্ধী তথা ওয়ার্কিং কমিটি মনোনীত প্রার্থী সীতারামাইয়াকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাস্ত করে দ্বিতীয়বারের মতোন সভাপতি নির্বাচিত হলেন। স্বীয় মনোনীত প্রার্থীর পরাজয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে গান্ধী সেই

সময়ে 'হরিজন' পত্রিকায় লিখছিলেন—"পট্টভি সীতারামাইয়ার পরাজয় প্রকৃতপক্ষে আমারই পরাজয়।" কিন্তু আসলে ইহা ছিল প্যাটেলের পরাজয়। সর্দার প্যাটেলেব এক জীবনীকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন; "It would be true to say that it was a defeat for Sardar Patel who had played a leading role in the whole affair." ইহাই প্রকৃত সত্য।

এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ্য। সেই সময়কার আন্তর্জাতিক অবস্থা ও ভারতে কংগ্রেস সংস্থার আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা এবং এর নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক যে ভুল বোঝাপড়া চলছিল, দূর থেকে এইসব পর্যবেক্ষণ করে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ বোধ করেছিলেন একজন। তিনি রবীন্দ্রনাথ। তিনি এই সময়ে সুভাষচন্দ্র ও জওহরলাল দুজনকেই একবার শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। ২৮শে নবেম্বর, ১৯৩৮, তাঁর তৎকালীন প্রাইভেট সেক্রেটারি অনিলকুমার চন্দ কবির নির্দেশমত জওহরলালকে যে পত্রখানি লিখেছিলেন তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, দ্বিতীয়বারের জন্য ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্রই কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হন—ইহাই ছিল কবির অভিপ্রেত। ঐ পত্রের একস্থলে লেখা আছে, "He therefore is very eager to see Subhasbabu again elected the President. He recently wrote to Gandhiji about this. And if he meet you now—he would in all probability seek your help in getting Subhasbabu re-elected." বলা বাহুল্য, কবির এই সুভাষ-প্রীতি সেই সময়ে গান্ধী বা জওহরলাল কেউ-ই প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারেন নি।

১০ই মার্চ ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। গান্ধী এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন না; সুভাষচন্দ্রও না। তিনি তখন

অসুস্থ। প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতির কাজ চালিয়ে নিলেন মৌলানা আজাদ এবং তাঁর বক্তৃতা পাঠ করলেন আর একজন। কিন্তু বিরোধ দেখা দিল সুভাষচন্দ্রের একটি প্রস্তাব নিয়ে। সুভাষচন্দ্র মনে করতেন যে, সমস্ত দেশ এখন ব্যাপক গণ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত। তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতের দাবী মেনে নেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে একটি চরমপত্র দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। এই প্রস্তাবের ফলে চরম সংকটের সৃষ্টি হোল। ত্রিপুরীতে বিষয় নির্বাচনী সভায় গোবিন্দবল্লভ পন্থ-কর্তৃক উত্থাপিত কুখ্যাত 'পন্থ প্রস্তাব' পাস হয়ে গেল—সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবটি সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হয়। সেদিন তিনি অসুস্থ শরীরে মঞ্চের উপর বসেই তাঁর প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতার একস্থানে তিনি বলেছিলেন, "ক্ষমতার লোভে আমাদের মধ্যে যেমন দুর্নীতি ও দুর্বলতা এসেছে, নির্মমভাবে তার মূলোচ্ছেদ করবার জন্য আমাদের উপায় নির্ধারণ করতে হবে।" স্বাধীন ভারতের বর্তমান শাসকগণকে সুভাষচন্দ্রের এই সাবধান বাণী একবার স্মরণ করতে বলি। ত্রিপুরী কংগ্রেসের সমগ্র বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, যেহেতু তিনি গান্ধীর বিরোধিতা করে নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যেহেতু তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে চরমপত্র দেওয়ার কথা বলেছিলেন, সেইজন্য কংগ্রেস পার্টির তখনকার "Super-Hitler" সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল গান্ধীর মর্যাদা রক্ষা করার জন্য সেদিন যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তা কংগ্রেসের ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত অধ্যায় বলেই বিবেচিত হবে।

এই সময়ে (২১শে মার্চ, ১৯৩৯) শরৎচন্দ্র বসু গান্ধীকে যে পত্রখানা লিখেছিলেন তার থেকে কিছু অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করে আমরা এই অধ্যায় শেষ করলাম। তিনি ত্রিপুরীতে উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানকার সকল ঘটনাই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র

লিখছেন, "What I saw and heard at Tripuri during the seven days I was there, was an eye-opener to me. The exhibition of truth and non-violence that I saw in persons whom the public look upon as your chosen disciples and representatives has, to use your own words 'stunk in my nostrils.' The propaganda that was carried on by them there against the Rashtrapati and those who happen to share his political views was thoroughly mean, malicious and vindictive, and utterly devoid of even the semblance of truth and non-violence."

শরৎচন্দ্রের এই নির্ভীক ও সুস্পষ্ট মন্তব্যের পর আর বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

৬

ত্রিপুরী কংগ্রেস, কংগ্রেসের সমগ্র ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। এর আনুপূর্বিক ইতিহাস জানতে হলে এই সময়ে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে, এবং জওহরলাল ও সুভাষ-অগ্রজ শরৎচন্দ্রের মধ্যে যেসব পত্রবিনিময় হয়েছিল সেইগুলি বিশেষভাবে অনুধাবন করতে হয়। আগেই বলেছি, ত্রিপুরী কংগ্রেসের কিছু পূর্বে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে জওহবলাল ও সুভাষচন্দ্র অল্প কয়েকঘণ্টার জন্য শান্তিনিকেতনে মিলিত হন এবং তখন উভয়ের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়েছিল বলে জানা যায়। সেই আলোচনার সূত্র ধরে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯, এলাহাবাদ থেকে জওহরলাল সুভাষচন্দ্রকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুভাষচন্দ্র জয়লাভ করেছেন। শান্তিনিকেতনেই তাঁর সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে নেহরু যা বলেছিলেন তারই পুনরুল্লেখ করে এই চিঠিতে তিনি লিখলেন: "As I told you, your contested election has done some good and some harm. I recognise the good but I am apprehensive of the harm that will follow." তাঁর মতে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সংঘর্ষ না ঘটলেই ভাল ছিল। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে জওহরলাল তাঁর নিজের কর্তব্য স্থির করার আগে সুভাষচন্দ্রের কাছে জানতে চাইলেন—"What you want the Congress to be and to do." তিনি লিখলেন—"এই বিষয়ে আমি দিশাহারা বললেই হয়। বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী সম্পর্কে অনেক কথাই শোনা যাচ্ছে। ফেডারেশন সম্পর্কেও সমালোচনা হচ্ছে—অথচ তোমার সভাপতিত্বে ওয়ার্কিং কমিটিতে এইসব বিষয় নিয়ে কোনো আলোচনাই হয় নি। আমি জানি না, তুমি কাকে

বামপন্থী এবং কাকেই বা দক্ষিণপন্থী বলে বিবেচনা কর। তবে তোমার নির্বাচনী লিপিসমূহ পাঠ করে আমার মনে হয়েছে, গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁর অনুগামীদের তুমি দক্ষিণপন্থী বলে মনে কর এবং তাঁদেরই যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁদের তুমি বল বামপন্থী। আমার বিবেচনায় তোমার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কঠিন ভাষা প্রয়োগ করে কংগ্রেসের পুরাতন নেতৃত্বের সমালোচনা করা এবং তাকে আক্রমণ করা-ই কি রাজনীতিতে Leftism-এর পরিচায়ক?" তারপর সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতিত্বের প্রতি কটাক্ষ করে জওহরলাল লিখেছেন যে বিগত এক বৎসরের মধ্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কার্যালয় পরিচালনায় যারপরনাই বিশৃঙ্খলা ও অমনোযোগিতা দেখা দিয়েছে এবং এরই ফলে কংগ্রেসের সদর দপ্তর যেমন ঠিকমত পরিচালিত হচ্ছে না, তেমনি এর সাংগঠনিক দিকটাও দুর্বল হয়ে পড়েছে।

এরপর জওহরলাল লিখেছেন: "These and many other questions arise in my mind and I know that many others are troubled by them, including those who have voted for you in the election........ The formation of the Working Committee will raise a host of problems.... We have got into an unhappy tangle and for the moment I see no way out. I am prepared to try my best but the clarification and lead must come from you and then it is possible for others to decide as to whether they fit in or not."

এই সুদীর্ঘ পত্রের শেষাংশে জওহরলাল লিখেছেন: "Public affairs involve principles and policies. They also involve an understanding of each other and faith

in the **bonafides** of colleagues. If this understanding and faith are lacking, it is very difficult to co-operate with advantage.... This is a matter of the most serious concern to me." এই চিঠিতেই তিনি দেশীয় রাজ্যগুলির সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা এবং কিষাণ ও মজদুরদের কথাও উল্লেখ করে ঐসব বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের সুনির্দিষ্ট অভিমত জানতে চাইলেন। জওহরলালের এই পত্রখানি পাঠ করলে মনে হবে যে, একজন সুকোশলী কৌঁসুলির মতো তিনি গান্ধী-প্রভাবিত এবং ক্ষয়িষ্ণু দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকেই সমর্থন করে সুভাষচন্দ্রের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের একটি একদেশদর্শী সমালোচনা করেছেন।

ফেব্রুয়ারি ১০, ১৯৩৯ তারিখে গয়া থেকে সুভাষচন্দ্র জওহরলালের এই পত্রের উত্তরে লিখলেন: "প্রিয় জওহর, তুমি আমার দোষক্রটির কথা উল্লেখ করেছ। যদিও আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন তথাপি বলব যে, এর একটা অন্য দিকও আছে। তাছাড়া, যেসব বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল তা বিস্মৃত হলে চলবে না। এই চিঠিতে আমি এই বিষয়ে কিছু উল্লেখ করতে চাই না—করতে চাই না এই কারণে যে, তাহলে বিতর্কের সৃষ্টি হবে এবং অন্যের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে হবে। প্রধান বিষয় হচ্ছে ত্রিপুরী কংগ্রেসে আমাদের কার্যসূচী কি হবে। জয়প্রকাশ ১১ তারিখে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন এবং এই কার্যসূচী সম্পর্কে আমার চিন্তা-ভাবনার কথা তিনিই তোমাকে জ্ঞাত করাবেন। রাজকোট ইত্যাদি সম্পর্কে তুমি সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়েছ আমি তা দেখেছি। ব্রিটিশ সরকার এইসব সামন্তনৃপতিদের মারফৎ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বদ্ধপরিকর—এই ফাঁদে আমাদের না যাওয়াই উচিত। দেশীয় রাজ্যগুলির সমস্যা নিয়ে সামন্তনৃপতিদের বিরুদ্ধে

সংগ্রাম করবার সঙ্গে সঙ্গে—We should throw out a direct challenge to the British Government over the issue of Swaraj. তোমার বিবৃতির মধ্যে আমি এর কোনো ইঙ্গিত খুঁজে পেলাম না। যদি স্বরাজের প্রশ্নটি আমরা বিসর্জন দিই, তাহলে কি আমরা আমাদের মূল লক্ষ্য থেকে সরে যাব না? সাক্ষাতে এ বিষয়ে আরো আলোচনা করা যাবে।"

এরপর যথাসময়ে ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন হয়ে যাওয়ার পর ২৪শে মার্চ, ১৯৩৯, জওহরলাল শরৎচন্দ্র বসুকে একখানা সুদীর্ঘ পত্র লিখলেন। ত্রিপুরী থেকে শরৎচন্দ্র মহাত্মা গান্ধীকে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন (পূর্ব অধ্যায়ের শেষভাগে উদ্ধৃত) গান্ধী সেই চিঠি জওহরলালকে দেখিয়েছিলেন এবং এই পত্রে জওহরলাল শরৎচন্দ্রের এই পত্রের ভাব ও ভাষার মধ্যে তীক্ষ্ণতা দেখে স্পষ্টতই ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হন। তাঁর নিজের কথায়—"I have read this with sorrow and surprise." গান্ধীর নেতৃত্বে একান্ত বিশ্বাসী জওহরলালের পক্ষে এই উক্তি স্বাভাবিক ছিল এবং শরৎচন্দ্র তাঁর পত্রে ব্যক্তিগত যেসব প্রশ্ন তুলেছিলেন, তার সত্যাসত্য বা গভীরতা অনুধাবন করার মতো ধৈর্য জওহরলালের তখন ছিল না। গান্ধীজির নেতৃত্বকে রক্ষা করবার আগ্রহেই তিনি এখানেও কৌঁসুলির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে লিখলেন: "I feel strongly that the President's allegations in his statements were unfair to his colleagues and should be withdrawn." তারপর তিনি কুখ্যাত 'পন্থ-প্রস্তাব'-এর স্বপক্ষে ওকালতি করে লিখলেন—"The Tripuri resolution envisaged co-operation between the Congress President and Gandhiji and the policy was more or less to continue without a break. Your letter seems to imply that this is not possible. Whether this is

Subhas's view also, I do not know." ত্রিপুরী কংগ্রেসে রাষ্ট্রপতির প্রতি বিরোধিতার উল্লেখ ছিল শরৎচন্দ্রের পত্রে। এই বিরোধিতা এসেছিল কংগ্রেসের গান্ধী-প্রভাবিত বর্ষিয়ান সভ্যদের কাছ থেকে। জওহরলাল তাঁর চিঠিতে এই বিরোধিতার অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দিয়ে লিখলেন: "I do not know what obstruction there was." স্বয়ং ত্রিপুরীতে উপস্থিত থেকেও জওহরলাল এই জিনিসটা যে উপলব্ধি করতে পারলেন না, এটা বিস্ময়ের কথা বৈকি। Policy ও Principle—এই দুটি বুলি আওড়ে জওহরলাল তাঁর পত্রখানি শেষ করেছেন। শরৎচন্দ্রকে লেখা এই চিঠির একটি প্রতিলিপি তিনি সুভাষচন্দ্রকেও পাঠিয়েছিলেন।

যথাসময়ে সুভাষচন্দ্র এর জবাব দিলেন। তিনি তখন মানভূমের জিয়ালগোরায় অবস্থান করছিলেন। তাঁব এই চিঠির তারিখ ২৮শে মার্চ, ১৯৩৯। সুদীর্ঘ এই পত্রখানি তাঁর লেখা বহু মূল্যবান চিঠির মধ্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় এবং সমকালীন কংগ্রেসী নেতৃত্বের নিখুঁত চিত্র আমরা পাই তাঁর এই ঐতিহাসিক পত্রে। এই চিঠির তৃতীয় অনুচ্ছেদটি বিশেষ মূল্যবান এবং ভবিষ্যতে যাঁরা নিরপেক্ষভাবে কংগ্রেসের ইতিহাস রচনা করবেন তাঁরা যেন এটি বিশেষভাবে পাঠ করেন। সুভাষচন্দ্র লিখছেন:

"বিগত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পরে বিদ্বেষমূলক যে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে আমার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। তোমার নিজের উক্তি ও বিবৃতিসমূহে প্রতিটি বক্তব্যই ছিল আমার বিপক্ষে। দিল্লীতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় তুমি নাকি বলেছিলে যে, নির্বাচনে আমার হয়ে যাঁরা কাজ করেছেন এবং আমার পক্ষে নিজে ঐ বিষয়ে লিপ্ত হওয়া তুমি আদৌ পছন্দ করনি। আমি জানি না তোমার মনের প্রকৃত কথা

কি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তুমি এই তথ্যটি বেমালুম বিস্মৃত হয়েছিলে যে, সংবাদপত্রে ডঃ পট্টভির নির্বাচনী আবেদন প্রকাশিত হবার পরে আমার আবেদন প্রকাশিত হয়। আর ক্যানভ্যাসিং-এর কথা যা তুমি উল্লেখ করেছ জ্ঞানত হোক বা অজ্ঞানত হোক, তুমি এই তথ্যটিও বিস্মৃত হয়েছিলে যে, অন্যপক্ষে যথেষ্ট ক্যানভ্যাসিং চলেছিল এবং ডঃ পট্টভির পক্ষে ভোট সংগ্রহের জন্য কংগ্রেস মন্ত্রীদের এবং কংগ্রেস পরিচালিত শাসনযন্ত্রের যথেষ্ট সহায়তা ও সুযোগ নেওয়া হয়েছিল। অন্যপক্ষে কংগ্রেস সেবা সঙ্ঘ, কংগ্রেস সরকারী শাসনযন্ত্র, চরখা সঙ্ঘ প্রভৃতি সংস্থাগুলির পূর্ণ সুযোগও লওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসের সমস্ত বড় বড় নেতা এবং তুমিও আমার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলে। শুধু তাই নয়। এই নির্বাচনে জয়লাভ করবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর নাম ও তাঁর প্রভাবেরও পূর্ণ সুযোগ লওয়া হয়েছিল। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির অধিকাংশই ডঃ পট্টভির স্বপক্ষে ছিল। এই প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমার কি ছিল?—আমি তো একক প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তুমি কি জানো—আমি স্বয়ং এই বিষয়ে বিলক্ষণ অবগত আছি—যে, বহুস্থানে ডঃ পট্টভির জন্য ক্যানভাস করা হয়নি, ক্যানভাস করা হয়েছিল গান্ধীজির নামে এবং গান্ধীবাদের নামে, যদিও বহুলোক এই জাতীয় প্রচারকার্য দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত হয়নি। তথাপি, এক জনসভায় দাঁড়িয়ে, তুমি মিথ্যা ভিত্তিকে আশ্রয় করে আমাকে হীন প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছ।"

ত্রিপুরী কংগ্রেসের নির্বাচনের প্রাক্কালে গান্ধী-অধ্যুষিত কংগ্রেসের শিবিরে সেদিন সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে কি হীন চক্রান্ত চলেছিল, তাঁর পত্রের এই অংশে সেইটাই বিশেষভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে, দেখা যায়। তারপর জওহরলালের পত্রে ব্যক্তি ও নীতির ('Person and principle') প্রসঙ্গ তুলে তাঁর এই পত্রে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন: "It never struck you that you want

us to forget persons, only when certain persons are concerned. When it is a case of Subhas Bose standing for re-rlection, you run down personalities and lionize principles etc. When it is a case of Maulana Azad standing for re-election, you do not hesitate to write a long panegyric. When it is a case of Subhas Bose versus Sardar Patel and others, then Subhas Bose must first of all clear up the personal issue. When Sarat Bose complains of certain things at Tripuri, he is, according to you, coming down to personal questions, when he should be conforming to principles and programmes. I confess that my poor brain is unable to follow your consistency."

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হোল, কিন্তু সেদিন সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে গান্ধীপ্রমুখ নেতৃবৃন্দ, এবং বিশেষ করে তাঁর 'রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী' জওহরলাল স্বয়ং যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার স্বরূপটা আমাদের জানা দরকার। জওহরলাল তাঁর পত্রে এই অভিযোগ করেছিলেন যে, ন্যাসন্যাল ও ইণ্টারন্যাসন্যাল সমস্যাগুলি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের 'পলিসি' খুব পরিষ্কার নয়। সুভাষচন্দ্র এর উত্তরে লিখলেন যে, ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি যে সংক্ষিপ্ত ভাষণটি দিয়েছিলেন তার মধ্যে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর নীতি ব্যাখ্যা করেছেন। সেই নীতি ছিল—"To force the issue of Swaraj with the British Government"—এবং এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তিনি কংগ্রেস থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে একটি চরমপত্র বা Ultimatum দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। এই চরমপত্র দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত

হয়নি এবং তার পরিবর্তে 'National Demand' শীর্ষক যে ফাঁকা প্রস্তাবটি ত্রিপুরী কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল সুভাষচন্দ্র সেই প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর এই পত্রে বলেছেন: "I am sorry that such a beautifully vague resolution, containing pious platitudes, does not appeal to me.... Frothy sentiments and pious platitudes do not make foreign policy." গান্ধী-প্রভাবিত সেদিনের কংগ্রেস নেতৃত্ব যে সত্যিই বাস্তববুদ্ধিবিবর্জিত ছিল, এবং সুভাষচন্দ্র যে তারই বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন—এটা বুঝতে পারলেই ত্রিপুরী নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মর্ম অনুধাবন করা কিছুমাত্র কঠিন হয় না। আমার বিবেচনায় জওহরলালকে লেখা সুভাষচন্দ্রের এই কুড়ি পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রখানি তাঁর তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারার একটি মূল্যবান দলিল হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। এই পত্রের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা আর বলিষ্ঠ বাস্তববোধ। ভারত ত্যাগ করবার আগে জওহরলালের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের ইহাই শেষ পত্রালাপ।

ত্রিপুরীতে অহিংসা ও সত্যের পূজারীদের সুভাষ-বিরোধী মনোভাব চরমে উঠল ওয়ার্কিং কমিটি গঠন নিয়ে। পন্থ-প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, কংগ্রেস সভাপতিকে কংগ্রেস অনুমোদিত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে এবং গান্ধী অনুমোদিত ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে। সুভাষচন্দ্র তখন সমগ্র ব্যাপারটিতে মধ্যস্থতা করার জন্য গান্ধীকে চিঠি লিখলেন। কোনো ফল হোল না। তিনি উত্তর পেলেন—না, তিনি এ বিষয়ে কোনো সাহায্য করতে পারেন না। ১০ই এপ্রিল, ১৯৩৯ তারিখে সুভাষচন্দ্রকে লেখা গান্ধীর একটি পত্রের এই অংশটুকু উল্লেখযোগ্য : "How can we meet on the political platform ? Let us agree to differ there." উত্তরে সুভাষচন্দ্র লিখলেন : "If we come to the parting of the ways a bitter civil war will commence." তিনি আরো বললেন : এই গৃহযুদ্ধের ফলে কংগ্রেসের সংহতি দুর্বল হয়ে যাবে এবং শাসক-শক্তি এর সুযোগ গ্রহণ করবে। গান্ধী এ যুক্তি মানতে চাইলেন না—তিনি তাঁর নিজের মতে অটল রইলেন।

পরবর্তী ইতিহাস সুপরিচিত। এপ্রিলের শেষে কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসল। বিরোধ নিষ্পত্তির সকল আলোচনাই যখন ব্যর্থ হোল তখন সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করলেন এবং গান্ধীর নির্দেশে রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেসের গদিতে বসলেন। প্যাটেল এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না : গান্ধী অবশ্য কলিকাতায় এসেছিলেন সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে, কিন্তু তিনি বৈঠকে যোগদান করেননি, সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করেছিলেন এবং সুভাষচন্দ্র তাঁর সঙ্গে সেখানেই মিলিত হয়ে মিটমাটের শেষ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কংগ্রেসের নিজস্ব সভাপতির বিরুদ্ধে

অসহযোগের কৌশল প্রয়োগ করে গান্ধী সেদিন এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন—এক ইংরেজ সাংবাদিক এই মন্তব্য করেছেন। সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। সুভাষচন্দ্রের এই পদত্যাগকে তাঁর জীবনে দ্বিতীয়বার দিক্‌পরিবর্তন বলা যেতে পারে। তাঁর কলেজ-জীবনে প্রথম দিক্‌পরিবর্তনের মূলে ছিল ব্রিটিশের অবিচার আর এই দ্বিতীয়বার দিক্‌পরিবর্তনের মূলে দেখা গেল তাঁরই স্বদেশবাসী এবং রাজনৈতিক সতীর্থদের অবিচার। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবেই তিনি কংগ্রেস-সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং গান্ধী-মনোনীত প্রার্থীর বদলে জনসাধারণ তাঁকেই দ্বিতীয়বার ঐ পদে নির্বাচন করেছিল; গান্ধীর বিরোধিতা সত্ত্বেও জনসাধারণের ইচ্ছাতেই তিনি সভাপতি এবং নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর অনুকূলে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই সুভাষচন্দ্রের নির্বাচনী ইস্তাহারে তাঁর মনোভাব অবগত ছিলেন এবং তা জেনেই তো তাঁরা তাঁকে নেতা হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন। অথচ তাঁকে অ-গণতান্ত্রিক উপায়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হোল। একে চক্রান্ত ভিন্ন আর কি বলব? একে অবিচার ভিন্ন কি বলব? আর এই চক্রান্ত এবং অবিচারের মূলে ছিলেন একটি মাত্র ব্যক্তি। তিনি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

এই প্রসঙ্গে মাইকেল এডওয়ার্ডস তাঁর *The Last Years of British Rule in India* গ্রন্থে একটি যথার্থ মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন: "Gandhi now turned the technique of non-cooperation, not against the British, but against Congress's own President. Bose was forced to resign." বস্তুত কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ইতিহাসে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সভাপতিকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার পেছনে গান্ধীর যে অনেকখানি হাত ছিল, তা আজ পরিষ্কারভাবেই জানা গিয়েছে।* এইভাবেই সেদিন 'মাধুর্য ও আলোকের অবতার'

তাঁর অসপত্ন নেতৃত্বের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে দল থেকে অপসৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতিহাস একদিন বিচার করবে—এর দ্বারা গান্ধীর মহত্ত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, না ক্ষুণ্ণ হয়েছে?

কিন্তু সুভাষচন্দ্র ছিলেন অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। কলিকাতায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠকের অব্যবহিত পরেই তিনি সমস্ত বামপন্থী উপাদানকে সংহত করে গঠন করলেন একটি নূতন দল—ফরওয়ার্ড ব্লক। দলের মুখপত্র হিসাবে *Forward Bloc* নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। দলের এইরূপ নামকরণের সময় সম্ভবত দেশবন্ধু-প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড পত্রিকার কথা তাঁর মনে হয়ে থাকবে। ব্লকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয় যে, ইহা কংগ্রেসেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে কাজ করবে। সুভাষচন্দ্র আশা করেছিলেন নেহরু তাঁর দলে যোগদান করবেন, সতেরো বছর আগে যেমন তাঁর পিতা মতিলাল নেহরু যোগদান করেছিলেন দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলে। কিন্তু জওহরলাল মতিলাল ছিলেন না; পিতার সাহস পুত্রের মধ্যে কিছুমাত্র দেখা যায় নি—তিনি ছিলেন একান্তভাবেই গান্ধীর অনুগত জওহরলাল। তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দিলেন না, উপরন্তু খোলাখুলিভাবে এর তীব্র সমালোচনা করলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল, ব্লক হয়ত আমূল পরিবর্তনমূলক মতবাদের ছদ্মবেশে ক্রমে ক্রমে ফ্যাসিস্ট রূপ গ্রহণ করতে পারে। সেদিন নেহরু কেন, অনেকেই এইখানে সুভাষচন্দ্রকে ভুল বুঝেছিলেন। তাঁদের কাছে তাই মনে হয়েছিল যে সুভাষচন্দ্রের আপোষহীন জাতীয়তাবাদ, সংগঠন ও নিয়মশৃঙ্খলার উপর তাঁর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ সবই বুঝি ফ্যাসিস্টগন্ধী। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট দলও দূরে সরে রইল। কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতৃত্বকে সেদিন সুভাষচন্দ্র যে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, পরবর্তী ইতিহাসের আলোকে আমরা আজ এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, দেশের সমগ্র বামপন্থী দলগুলি যদি তাঁকে সমর্থন জানাত তা'হলে

ইতিহাস সেদিন ভিন্ন রূপ ধারণ করত। ভারত-বিভাগ মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে স্বাধানতালাভের মতোন অপমানজনক ঘটনা নাও ঘটতে পারত। কিন্তু ইতিহাসের যা ললাট-লিখন তা তো খণ্ডাবার নয়।

অতঃপর ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা হিসাবে সুভাষচন্দ্রের কার্যাবলী কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের মনে ত্রাসের সঞ্চার করতে থাকে। জুলাই মাসে তিনি যখন কংগ্রেসের একটি কাজের প্রতিবাদস্বরূপ সারা ভারতে আহ্বান জানালেন, তখন দক্ষিণপন্থী নেতারা স্বভাবতই বিচলিত এবং বিব্রত বোধ করলেন। প্রতিশোধের শেষ আঘাত তাঁরা হানলেন—সুভাষচন্দ্রের ওপর তাঁরা তিন বছরের জন্য নিষেধ-আজ্ঞা (ban) জারি করলেন। এই নিষেধের অর্থ এই ছিল যে, যেসব কংগ্রেস কমিটির মনোনয়নের ক্ষমতা আছে—তিন বছর পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র সেইসব কমিটির কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না। ১৯৩৯, ১১ই আগস্ট, বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল এবং ঐ দিনই সন্ধ্যায় সুভাষচন্দ্রের কাছে তারবার্তা এসে পৌঁছয়। "Is that all ?"—সেদিন এই কথা বলেছিলেন সুভাষচন্দ্র। সেদিন তাঁর সহকর্মী ও অনুগামীদের অনেকেই বলেছিল: "এইবার বুঝি সুভাষ-বাবুর রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে গেল।" কিন্তু তাঁরা জানতেন না কী ধাতু দিয়ে তৈরি এই বিদ্রোহী। যখন তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—"আমি কারো প্রতিচ্ছবি নই, প্রতিধ্বনিও নই—কারো proto-type নই—I am myself" তখনই তাঁর স্বরূপ প্রকাশ পেল। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হওয়ার দরুন সুভাষচন্দ্রের মনে অত্যন্ত আঘাত লেগেছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সুভাষচন্দ্রের প্রতি কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের এই অবিচারে সেদিন রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছিলেন। কিছুকাল আগে থেকেই দেশের রাজনৈতিক ও বিশেষভাবে কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ-জনিত ভাঙনের ব্যাপার নিয়ে তিনি

চিন্তাকুল ছিলেন। কবি গান্ধীকে টেলিগ্রাম যোগে ( এর তারিখ ১৯৩৯, ডিসেম্বর ২০ ) অনুরোধ করলেন যে, "দেশের ও বিশেষভাবে বাঙলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে সুভাষকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে নিলে দেশের মঙ্গল হবে।" উত্তরে গান্ধী জানালেন, "কংগ্রেস হাইকমাণ্ড সব বুঝেসুঝেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সুভাষবাবুর ওপর থেকে নিষেধ উঠিয়ে নেওয়া হবে যদি তিনি কংগ্রেসের শাসন মানেন।" এই সময়ে এনড্রুজ সাহেবকে লেখা এক চিঠিতে গান্ধী সুভাষচন্দ্রকে "Spoilt child of the family" বা "পরিবারের আব্দারে ছেলে" বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই ধৃষ্টতা অমার্জনীয়।

১৯৩৯ সনটি সুভাষচন্দ্রের জীবনে নানা কারণেই স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভ থেকেই রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ ও সাগ্রহ দৃষ্টি ছিল সুভাষচন্দ্রের ওপর। ১৯৩৭ সনে য়ুরোপ থেকে সদ্যপ্রত্যাগত সুভাষচন্দ্র বেলঘরিয়ায় অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বাড়িতে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথাই তাঁর সঙ্গে হয়েছিল। হরিপুরা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হওয়ার পর কবি সুভাষচন্দ্রকে সাক্ষাৎভাবে অভিনন্দিত করেন। সেই সময় ( ১৯৩৮, ফেব্রুয়ারি ) ছায়া সিনেমা হলে 'চণ্ডালিকা'র অভিনয় হবে; কবি অসুস্থ শরীর নিয়ে কলিকাতায় এসেছেন। অভিনয়ের প্রথম রজনীতে সুভাষচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন—সেইখানেই কবি তাঁকে মৌখিক অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ঐ সময়ে ( ১৯৩৮, ডিসেম্বর ) কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে শ্রীনিকেতন শিল্পভবনের একটি স্থায়ী ভাণ্ডার খোলা হয়—পাঞ্জাব থেকে কলিকাতায় এসে কংগ্রেস সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র এর দ্বারোদঘাটন করেন।

১৯৩৯, ২১ জানুয়ারি।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র কবি-সন্দর্শনে শান্তিনিকেতনে এলেন। শান্তিনিকেতন ও বোলপুববাসীরা কংগ্রেসের সভাপতির যথোপযুক্ত সম্মান দান করেছিলেন। কবি স্বয়ং তাঁকে আম্রকুঞ্জে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন ও আশীর্বাদ করেন। এই সময়ের আর একটি ঘটনা। বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে 'তাসেব দেশ' নাটিকার দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুল; কবি এই নূতন সংস্কবণটি সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করলেন। উৎসর্গলিপিতে তিনি লিখলেনঃ "কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুভাষচন্দ্র, স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণসঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মবণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলাম।"

১৯৩৯ সনে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে হাইকমাণ্ডের নেতৃস্থানীয়দের মতবিরোধ কবিব দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারল না। কারণ সুভাষচন্দ্রের নানা কর্ম ও মতবাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি ছিল। ত্রিপুরীতে বিরোধপর্বের পর কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় সুভাষচন্দ্র যখন পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন, তখন এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বাঙলা দেশেব একশ্রেণীব লোকের মধ্যে কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে। কবি দূর থেকে দেশের সমস্ত সংবাদ রাখতেন। তিনি মনে করতেন, "দেশের মধ্যে প্রবীণ ও নবীন এই দুই দলের দ্বন্দ্বের সময় সুভাষচন্দ্রই দেশনায়কত্ব করবার উপযুক্ত ব্যক্তি।" তাই দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁব পদত্যাগের পরই (১৯৩৯, মে) রবীন্দ্রনাথ 'দেশনায়ক' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করতে চাইলেন। নানা কারণে তখন এই ভাষণটি ছাপা হলেও প্রচার করা হয়নি এবং তখনকার মতোন সংবর্ধনাও স্থগিত থাকে। কিন্তু কিছুকাল পরেই মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কবি সুভাষচন্দ্রকে সর্বসাধারণ সমক্ষে অভিনন্দিত করেছিলেন।

কলিকাতায় একটি স্থায়ী কংগ্রেসভবন স্থাপন করার ইচ্ছা সুভাষচন্দ্রের অনেক দিনের। ১৯৩৯, আগস্ট মাসে তাঁর কাছ থেকে অনুরোধ এলো রবীন্দ্রনাথের নিকট—মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে হবে। এজন্য চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর ওপর পৌরসভা একবছর আগেই একখণ্ড জমি দান করেন। ১৮ই আগস্ট এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হয়। শান্তিনিকেতন থেকে কবি এলেন কলিকাতায়। 'মহাজাতি সদন' নামটি তাঁরই দেওয়া। বহুলোকের সমাবেশে এবং বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে এই উৎসবটি সম্পন্ন হয়। সেদিন সুভাষচন্দ্র তাঁর অভিভাষণে বলেছিলেন: "যে সমস্ত কল্যাণ প্রচেষ্টার বলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তিত্ব ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হবে—এই গৃহ তারই জীবন-কেন্দ্র হয়ে 'মহাজাতি সদন' নাম সার্থক করুক।" জাতির জাগ্রত চিত্তকে আহ্বান করে সেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বলেছিলেন: "বীর্য এবং সৌন্দর্য, কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা এবং সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যা এবং জনসেবার আত্মনিবেদন, এখানে নিয়ে আসুক আপন আপন বিচিত্র দান।" দুঃখের বিষয়, কংগ্রেস সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে মহাজাতি সদন এখন একটি জলসাঘরে পরিণত হয়েছে; সেখানে সুভাষচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ, কারো কল্পনাই মূর্তরূপ গ্রহণ করেনি।

হাইকমাণ্ডের নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়া সত্ত্বেও দেখা গেল যে, সর্বভারতীয় রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র হ্রাস পেল না। এই বছরের অক্টোবর মাসে তিনি গৌহাটিতে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন এবং নাগপুরে আহূত সাম্রাজ্যবিরোধী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১লা নভেম্বর নিখিলভারত ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য তিনি দিল্লী যাত্রা করেন।

ইতিমধ্যে য়ুরোপের ঘটনাবর্ত দ্রুতবেগে প্রবাহিত হয়েছে এবং অবশেষে ৩রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করল। য়ুরোপে যুদ্ধঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বড়লাট জনমতের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে একটি যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করলেন—এমন কি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদেও এ বিষয়ে কোনো আলোচনা উত্থাপিত হতে দেওয়া হোল না। শুধু তাই নয়; অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স জারি করে দমনমূলক কার্য নিরঙ্কুশভাবে চলতে থাকে। য়ুরোপে যে যুদ্ধ বাধবে, একথা সুভাষচন্দ্র কয়েক বছর আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ১৯৩৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যুদ্ধ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং এই প্রস্তাব রচনার কাজে সহায়তা করবার জন্য কমিটি সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি।

গান্ধী তখনো পর্যন্ত ব্রিটিশের হৃদয়ের পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করতে চাইলেন দেখে সুভাষচন্দ্র বললেন: "এখন হৃদয়ের পরিবর্তনে আমাদের কি লাভ? ব্রিটিশ শক্তি অন্তিম দশায় এসে পৌঁছেছে; এখন আমাদের উচিত তাদের শিথিল হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়া। এ যদি কংগ্রেস না করতে পারে তা'হলে সে ঘোর দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেবে এবং দেশের লোক বুঝবে ভারতে ইংরেজশাসনের স্থায়িত্বই বুঝি কংগ্রেসের কাম্য।"

এই পরিবেশে ১৯৪০ সনের মার্চ মাসে রামগড়ে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসল। ঐ সময়ে রামগড়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'Anti-Compromise Conference' বা আপোষ-বিরোধী সম্মেলন একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। সুভাষচন্দ্র এই সম্মেলনে যোগদান করেন এবং তাঁর বক্তৃতায় অবিলম্বে একটি সর্বভারতীয় আন্দোলন শুরু করার কথা বলেন; বলেন—"বিরামহীন ভাবে এই আন্দোলন এমনভাবে পরিচালনা করতে হবে যেন ১৯৩২-এর ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।" তিন মাস পরে জুন মাসে অনুষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের আর একটি কনফারেন্সে তিনি আরো জোর দিয়ে বললেন: "With every blow that she receives in

Europe the imperialist might of Britain is bound to loosen its grip on India.... Let us therefore cease talking of saving Britain with the Empire's help or with India's help. India must in this grave crisis think of herself first.... It is for the Indian people to make an immediate demand for the transference of power to them through a Provisional National Government."

সরকার দেখলেন সুভাষচন্দ্র ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছেন। কংগ্রেসের দিক থেকে তাঁদের আশঙ্কার কোনো কারণ ছিল না, কেন না, তখনকার কংগ্রেস শুধু কথা বলেছে, কাজ কিছুই করেনি। য়ুরোপে যুদ্ধ তখন ঘোরালো হয়ে উঠেছে, এমন অবস্থায় কোনো দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্টের পক্ষে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকা অসম্ভব। ১৯৪০, ২রা জুলাই তারিখে তাঁকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হোল। ঐসময়ে তিনি শহরে একটি আন্দোলন শুরু করেছিলেন—হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ আন্দোলন। এই স্মৃতিস্তম্ভটিকে তিনি জাতির পক্ষে অমর্যাদাকর বলে মনে করতেন। আটক হওয়ার আগে মহম্মদ আলি পার্কে সুভাষচন্দ্র একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ফরওয়ার্ড ব্লক কাগজে 'The Day of Reckoning' বা 'বুঝাপড়ার দিন' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা ও প্রবন্ধে রাজদ্রোহের আভাস পাওয়া গেল। সরকার তাঁর বিরুদ্ধে নিয়ে এলেন রাজদ্রোহের মামলা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জেলে থাকার সময়েই ২৮শে অক্টোবর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ইহাও ছিল তাঁর জনপ্রিয়তার একটি নিদর্শন।

অনেকে সেদিন মনে করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বুঝি নৈরাশ্যে ক্ষুব্ধ হয়েই মনুমেণ্ট অপসারণের মতোন সামান্য একটা আন্দোলন শুরু

করেছিলেন। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। ১৯২১ সনে স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার পর থেকে তাঁর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ নিরর্থক ছিল না, যেমন নিরর্থক ছিল না তাঁর মুখের উচ্চারিত কথা। তিনি কোনোদিনই নিজেকে ভারতবর্ষের 'ভাগ্যনির্ধারিত পুরুষ' বা Man of Destiny বলে মনে করতেন না ; বরং ইহাই সত্য যে, তাঁর সকল চিন্তা, সকল কর্ম পর্যবসিত হয়েছিল একটি কেন্দ্রবিন্দুতে —ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। এইটাই ছিল তাঁর creed, তাঁর ধর্ম, তাঁর ইষ্ট। সেই তাঁর ইষ্টদেবতার প্রতি অনুরাগে ও আনুগত্যে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

যাইহোক, কর্মহীন নিরর্থক বন্দীজীবন এইবার সুভাষচন্দ্রকে যেন করে তুলল অস্থির। এইবার তাঁর মনে এই ধারণা দৃঢ় হোল যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কেবলমাত্র গণআন্দোলন বা সন্ত্রাসবাদ যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন শক্তিশালী কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের সামরিক সহায়তা। তাঁর আরো ধারণা হোল এবারকার যুদ্ধে মিত্রশক্তির পরাজয় সুনিশ্চিত এবং সেই সঙ্গে ভারতের ওপর ইংরেজের বজ্রমুষ্টি শিথিল হতে বাধ্য। অক্ষশক্তি বা Axis power অর্থাৎ হিটলার-মুসোলিনী জোট যে জয়লাভ করবে, সে বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না। কিন্তু তারা কি বিনা স্বার্থে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভে তাঁকে সাহায্য করবে? রাশিয়ার কথাও তাঁর মনে হয়েছিল, বিপ্লবের বেদনা স্মরণ করে রাশিয়া আজো গর্ব অনুভব করে, হয়ত রাশিয়া ভারতের বন্ধন-বেদনার তীব্রতা অনুভব করতে পারবে। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এমন একজন সুপরিচিত ব্যক্তিকে বিদেশে দৌত্য নিয়ে যেতে হবে যাঁর কথা সবাই শুনবে। কে যাবে? "অবশেষে আমি সিদ্ধান্ত করিলাম আমি নিজেই যাইব?"—সুভাষচন্দ্র নিজে এই কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বন্ধু দিলীপকুমার লিখেছেন: "ভাগ্যকে পরাস্ত করার জন্য সুভাষ

একটা দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলল—দেশত্যাগ করাই মনস্থ করল।”

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর তিনি কারামুক্তির কথা চিন্তা করলেন। যেমন করেই হোক আগে জেলের বাইরে আসতে হবে। উপায়? উপায়—আমৃত্যু অনশনের প্রতিজ্ঞা। সুভাষচন্দ্র নিশ্চিত জানতেন যে, গভর্নমেণ্ট কিছুতেই তাঁকে জেলের মধ্যে অনশনে মরতে দেবেন না। ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪০। তিনি বাঙলার লাটসাহেবকে এক পত্র লিখলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের এই পত্রখানি তাঁর Political Testament হিসাবে গণ্য হওয়ার যোগ্য। সুভাষচন্দ্র লিখলেন:

“Though there may be no immediate, tangible gain, no sacrifice is ever futile. It is through suffering and sacrifice alone that a cause can flourish and prosper, and in every age and clime the eternal law prevails—'the blood of the martyr is the seed of the church.'

“To my countryman I say—'Forget not that the greatest curse for a man is to remain a slave. Forget not that the greatest crime is to compromise with injustice and wrong. Remember the eternal law—you must give life if you want to get it.”

“জীবন পেতে হলে জীবন দিতে হয়”—সমগ্র সুভাষ-চরিত্র যেন আভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর এই একটি কথার মধ্যে। তিনি আজ সেই জীবন বলি দিতেই সংকল্প করলেন। পত্রে লাটসাহেবকে জানালেন যে, তিনি ২৯শে নভেম্বর থেকে জেলের মধ্যে অনশন আরম্ভ করবেন। এই পত্রের অন্তর্গত নৈতিক আবেদন অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করা সরকারের পক্ষে সহজ ছিল না। তাই এর দু'দিন

পরেই তাঁকে তাঁর স্বগৃহে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। ২৬শে জানুয়ারি, ১৯৪১, আলিপুর ফৌজদারি আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত রাজদ্রোহ মামলার বিচারের দিন ধার্য ছিল। ২৯শে ডিসেম্বর তাঁর রোগশয্যা থেকে তিনি বড়লাটকে একখানি পত্র লিখলেন। ঐ পত্রে তিনি বিশেষভাবে বাঙলার অবস্থা আলোচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। বাড়িতে এসে অবধি তিনি নির্জনে বাস করতেন, কারো সঙ্গে বড় একটা দেখা করতেন না। ১৬ই জানুয়ারি, ১৯৪১, তাঁর কয়েকজন বন্ধু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন সুভাষচন্দ্রের মুখখানি একটি পরিচ্ছন্ন দাড়িতে পরিশোভিত হয়েছে—তাঁকে এখন দেখতে ঠিক যেন উত্তরপ্রদেশবাসী একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান। তখন ঘুণাক্ষরেও কেউ বুঝতে পারেন নি এই দাড়ি গজানোর পিছনে তাঁর মনের মধ্যে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল।

১৭ই জানুয়ারি, ১৯৪১।

গভীর রাত্রি। চারদিক নিস্তব্ধ।

৩৮।২, এলগিন রোডের বাড়ির দরজায় একখানি মোটর গাড়ি এসে দাঁড়াল। বাড়ির সবাই তখন ঘুমিয়ে, এমন সময়ে একজন দীর্ঘদেহ মৌলভী ধীরে ধীরে গৃহ থেকে নিক্রান্ত হয়ে সেই গাড়িতে উঠলেন সামান্য জিনিসপত্র নিয়ে। চালক ভিন্ন তৃতীয় কোনো আরোহী ছিল না। চালক তাঁরই অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরকুমার বসু। এই ছদ্মবেশেই সেদিন সুভাষচন্দ্র বসু 'মৌলভি জিয়াউদ্দিন' রূপে ভারতবর্ষ থেকে তাঁর ঐতিহাসিক পলায়ন-যাত্রা শুরু করেছিলেন।

এই রহস্যজনক অন্তর্ধানের প্রসঙ্গে শিশিরকুমার বসু বলেছেন: "মুক্তিলাভের পর হইতেই নেতাজীর যাত্রার আয়োজন চলিতে

থাকে। ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি রাত্রি ১-২৫ মিনিটে আমরা একখানি মোটরযোগে সত্যসত্যই যাত্রা শুরু করিতে সমর্থ হই। উজ্জ্বল চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাত্রিতে আমাদের এই দুঃসাহসিক যাত্রা শুরু হইল। বাড়ীর বেশীর ভাগ লোকই তখন নিদ্রিত। নেতাজী পশ্চিমা মুসলমানের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া একটি সুটকেশ, বিছানা ও একটি এ্যাটাচী কেস্ সঙ্গে লইয়াছিলেন। এলগিন রোড হইতে যাত্রা শুরু করিয়া কলিকাতা শহর ছাড়াইয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া তীব্র বেগে আমাদের গাড়ী চলিল। সমস্ত রাত্রি চলিবার পর প্রত্যুষে আমরা একস্থানে আত্মগোপন করিলাম। সন্ধ্যায় আবার যাত্রা শুরু হইল; অধিক রাত্রিতে আমরা কলিকাতা হইতে আনুমানিক ২১০ মাইল দূরবর্তী গোমোতে পৌঁছিলাম, এইদিন ১৯৪১ সালের ১৮ই জানুয়ারি, শেষ-রাত্রিতে নেতাজী ট্রেনে উত্তরভারত অভিমুখে রওয়ানা হইয়া যান। স্টেশনেই তাঁহার নিকট হইতে আমি বিদায় লইলাম। বাঙলার সীমান্ত হইতে বহুদূরে লইয়া গিয়া তাঁহার যাত্রার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় নেতাজীর ভারত-ত্যাগের পরিকল্পনায় আমার কর্তব্য কার্যতঃ শেষ হইল। অতঃপর আমি বিদায় লইলাম, 'তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও'—ইহাই ছিল নেতাজীর শেষ কথা।"

ইতিহাসের রুদ্রদেবতা আহ্বান করলেন এই মহাবিদ্রোহীকে স্বাধীনতার চরমমূল্য দেওয়ার জন্য। সুভাষচন্দ্র সাড়া দিলেন সে আহ্বানে। একটা বিরাট ভবিষ্যৎ তখন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। কোথায় গেলেন, কেমন করে গেলেন, অনেকদিন পর্যন্ত সে সংবাদ কেউ জানত না। ইংরেজের সুদক্ষ পুলিসের চক্ষে ধূলো দিয়ে সুভাষচন্দ্র যেন হাওয়ায় অদৃশ্য হলেন। ১৯৪১ সালে ২৬শে জানুয়ারি ভারতের চল্লিশকোটি নরনারী শুধু এইমাত্র জানল যে—

সুভাষচন্দ্র আর ভারতে নেই। তাঁর সেই রহস্যময় অন্তর্ধানের কাহিনী আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বলব। ইংরেজের নজরবন্দী থেকে সুভাষচন্দ্রের এই দুঃসাহসিক অন্তর্ধান আমাদের নূতন করে স্মরণ করিয়ে দিল ঔরংজেবের নজরবন্দী থেকে শিবাজীর অন্তর্ধানের সেই ঐতিহাসিক কাহিনী।

সত্যিই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়।

তাঁর কাবুলের আশ্রয়দাতা উত্তমচাঁদ ভারতবর্ষ থেকে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের চমকপ্রদ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কাবুলে তাঁর রেডিওর দোকান ছিল, তিনিই যে সেখানে সুভাষচন্দ্রকে আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং অন্তর্ধানের গোপন ব্যবস্থার মধ্যে তাঁর কিছুটা হাত ছিল তাঁর বিবরণ থেকে সেটা বুঝতে পারা যায়। পরবর্তীকালে উত্তমচাঁদ কাবুলেই গ্রেপ্তার হয়ে ভারতবর্ষের কারাগারে দীর্ঘকাল বন্দী থাকেন এবং সেই সময়েই তিনি এই কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করেন। উত্তমচাঁদ লিখছেন ঃ

"১৯৪১ সালের শীতের রাত্রে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে শান্ত করে দিয়েছেন ভেবে আরামে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন—তখন দীর্ঘ শ্মশ্রু সুন্দর চেহারার একটি লোক, চশমার ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে তাঁর দৃঢ় সংকল্পের জ্যোতি, এলগিন রোডের একটি দ্বিতল বাড়ির নির্জন কক্ষে আত্মনির্বাসিত অবস্থায় থেকে তাদের বোকা বানিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সেই গৃহের চারদিকে শিকারের সন্ধানে সজাগ পাহারায় মোতায়েন ছিল কয়েকজন ভদ্রবেশী সরকারী গুপ্তচর পুলিস। তারা তাদের কবল থেকে সুভাষচন্দ্রকে পালিয়ে যেতে দেবে না—এই ছিল তাদের পণ। কিন্তু তাদের সতর্ক পাহারা এড়িয়ে একদিন রাত্রে তাদের শিকার পালিয়ে গেল। আপাদমস্তক মৌলভীর পোষাকে সজ্জিত হয়ে হেঁটে এসে তিনি মোটরে উঠলেন। নক্ষত্রবেগে গাড়িখানি ছুটে চলে গেল কোন দূরবর্তী রেল স্টেশনের দিকে। তারপর দিন সকালে দেখা গেল মৌলভীসাহেব একজন শিখ ভদ্রলোকের সামনাসামনি দ্রুতগামী একখানি রেলগাড়ির উচ্চশ্রেণীর কামরায় বসে আছেন। সর্বজনপরিচিত ছদ্মবেশী ভদ্রলোকটিকে শিখ ভদ্রলোক চিনতে

পারলেন না। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে মৌলভীসাহেব খুব গম্ভীর গলায় বললেন যে, তিনি লক্ষ্ণৌর বাসিন্দা—নাম তাঁর জিয়াউদ্দিন। তিনি বীমার দালালি করেন—সেই কাজেই বেরিয়েছেন।

"যখন লাল পাগড়ী পুলিসের দল কলিকাতার এলগিন রোডে তাদের কর্মতৎপরতা দেখাতে ব্যস্ত তখন সুভাষচন্দ্র বসু মৌলভীর ছদ্মবেশে ভারতসীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছেন। দু'দিনের মধ্যে তিনি পেশোয়ারে এসে পৌঁছে গেলেন। সেখানে ভকৎরাম তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। পেশোয়ারে তিনি মৌলভীর শেরওয়ানী ও ফেজ বদল করে পাঠানের পোষাক পরলেন। ভকৎরাম হলেন রহমৎ খাঁ। লক্ষ্ণৌর মৌলভী এখন হলেন কাবুলের পাঠান—মূক এবং বধির পাঠান। এই বেশেই তিনি রহমৎ খাঁর সঙ্গে কাবুলের দিকে রওনা হলেন। খাইবার গিরিপথের প্রবেশপথ পাহারা দিচ্ছে বিশাল জামরুদ দুর্গ; সেই দুর্গের পাশ দিয়েই গিয়েছে কাবুল সড়ক। রহমৎ খাঁ ও তাঁর সঙ্গী সেই প্রধান সড়ক দিয়ে না গিয়ে অন্য একটি পথ দিয়ে তাঁদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন। এইভাবে কয়েকদিন ধরে অতি বন্ধুর দুর্গম পথ অতিক্রম করে অবশেষে তাঁরা কাবুল নদের তীরে এসে উপস্থিত হলেন।

"নদী পার হওয়ার জন্য কোনো নৌকা পাওয়া গেল না, চামড়ার ব্যাগ জেলেদের জালে বেঁধে—সেই অদ্ভুত ভাসমান বাহনে চেপে তাঁরা নদী পার হয়ে গেলেন। কিন্তু বিপদ অপেক্ষা করছিল নদীর পরপারে। কাবুলের উন্মুক্ত আকাশ তলে, ভয়ঙ্কর শীতের মধ্যে দাঁড়িয়ে যদি কোনো যানবাহন পাওয়া যায় তারই আশায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেই রাস্তার পাশে বড় বড় গাছের ঝোপ—তারি মধ্যে একটি কূয়া—অবিরাম পদব্রজে এসে—পরিশ্রান্ত অবসন্ন দেহ নিয়ে সুভাষচন্দ্র সেই গাছের তলায় শুয়ে পড়লেন। শীতের সমাচ্ছন্ন কুয়াসার ওপর নেমে এল রাত্রির গভীর অন্ধকার। সুভাষচন্দ্র ঘুমিয়ে আছেন, রহমৎ খাঁ একখানি লরীকে থামালেন

কিন্তু অসংখ্য বাক্সতে বোঝাই সেই লরী—সুভাষচন্দ্র জেগে উঠে ভাবতে লাগলেন কি করে এ লরীতে বসা যাবে। কিন্তু লরীর 'ক্লিনারের' তাড়ায় তাঁর চিন্তার অবসর রইল না। অগত্যা একটি বাক্সের ওপর তিনি চড়ে বসলেন।

"এইভাবে তুষারাবৃত শীতের রাত্রে বিনা গরম পোষাকে তিনি একটা বাক্সের ওপর কোনোরকমে বসে রইলেন। মুক্ত প্রান্তর দিয়ে লরীখানি ছুটতে লাগল। মাঝে মাঝে গাছের লম্বিত শাখা প্রশাখার আঘাত লাগতে লাগল তাঁর দেহে, বার বার মাথা নীচু করে তাঁকে সে আঘাত সামলাতে হচ্ছিল। সে রাত্রির অভিজ্ঞতা অতি ভয়াবহ। দ্বিতীয় দিনে একজন আফগান গোয়েন্দা তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে—তাঁরা তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন। রহমৎ খাঁ বললেন তিনি তাঁর এই হাবা-কালা ভাই জিয়াউদ্দিনকে সাকী সাহেবের মসজিদে তীর্থ করাতে নিয়ে যাচ্ছেন। কাবুলে জিয়া-উদ্দিনেরা এমন কোনো আশার লক্ষণ দেখতে পেলেন না যাতে করে মনটা তাঁদের প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। সে শহরে তিনি ও তাঁর বন্ধুটি সম্পূর্ণ নবাগত। কিছুক্ষণ চলাফেরা করে একটি ছোট সরাইখানায় তাঁরা আশ্রয় নিলেন। অতি নোংরা সেই বাড়িটি। তার উঠানে একপাল উট আর খচ্চর এবং তাদের ছানাগুলি বারান্দায় বাঁধা। তাঁদের বাসের জন্য যে প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট করা হয় সেখানে দিনের আলো প্রবেশ করে না। সমস্ত দিন যেন সেখানে রাত্রির অন্ধকার বিরাজ করছে।"

লাহোর গেটের কাছে লরীচালকদের আড্ডা সেই সরাইখানায় তাঁদের জীবন শুধু পরিবেশের জন্যই দুর্বিসহ হয় নি, পুলিসি জুলুম ছিল উৎকণ্ঠার কারণ। সেই গোয়েন্দা পুলিসটি রোজই তাঁদের উপর জুলুম করত। রোজই তার ঘুষের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতো। ভেতরে ও বাইরে কনকনে শীত; কাঠের আগুন করে শরীর গরম রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। বাজার থেকে মোমবাতি কিনে এনে

ভকৎরাম আলোর ব্যবস্থা করেছিলেন। খাওয়ার জন্য আনা হোল শুক্‌নো রুটি আর কাবাব। সুভাষচন্দ্র সেই রুটি খেতে পারলেন না। তখন ভকৎরাম তাঁকে চা এনে দিলেন; তিনি সে চায়ের মধ্যে ডুবিয়ে রুটি খেলেন। প্রথম তিনদিন তাঁরা রাশিয়ান দূতাবাসের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করায় চেষ্টায় ব্যর্থকাম হন। কাবুলে তাঁদের কোনো বন্ধু ছিল না; ভকৎরামের পুস্তু ভাষায় দখল ছিল, কিন্তু তা এখানে কোনো কাজে লাগল না, কারণ এখানে পারস্যভাষার প্রচলন বেশি। সকল দূতাবাসই ছিল সুরক্ষিত, কোথাও যাওয়া সহজ ছিল না; একদিন রাস্তায় রাশিয়ান রাষ্ট্রদূতের গাড়ি থামিয়েও কোনো সুবিধা তাঁরা করতে পারলেন না। কদর্য নোংরা বাসস্থান, তাঁর নিজের সেই মূক-বধির ছদ্মবেশ, অতি সামান্য পরিচ্ছদ, কনকনে শীত—সব মিলিয়ে সুভাষচন্দ্রের মনকে ভারাক্রান্ত করে তুললো। কিন্তু এখন তো আর ফিরে যাওয়া যায় না? যাই হোক, যেমন করে পারা যায় এবং যতশীঘ্র সম্ভব এই দেশ তাঁকে ত্যাগ করতেই হবে। পঞ্চম দিনে একরকম মরিয়া হয়েই তিনি ভকৎরামকে ইতালিয়ান দূতাবাসে (Italian Legation) পাঠালেন। এইখানেই তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখা গেল।

৩রা ফেব্রুয়ারি সরাইখানা ছেড়ে সুভাষচন্দ্র উঠে এলেন উত্তম-চাঁদের আশ্রয়ে। উত্তমচাঁদের আশ্রয়ে তিনি ছিলেন ছয় সপ্তাহ এবং তারপর তাঁর কাবুল ত্যাগের ব্যবস্থা হয়। ইতালিয়ান দূতাবাস থেকে তাঁকে কেবলই জানান হচ্ছিল যে, রোম থেকে পাসপোর্ট এলেই তাঁর যাওয়ার ব্যবস্থা হবে। অবশেষে ১৮ই মার্চ সিনর ওর্ল্যাণ্ডো মোজোটা এই ছদ্মনামে য়ুরোপ থেকে প্রেরিত জনৈক বিশেষ দূতের সমভিব্যাহারে সুভাষচন্দ্র রুশ-সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করেন। বোখারা, হিন্দুকুশ, সমরখন্দ প্রভৃতি অতিক্রম করে এবং পথে কোথাও বিশ্রাম না করে তিনি মস্কো এসে পৌঁছলেন। এইখান

থেকে ২৮শে মার্চ ১৯৪১, বিমানযোগে তিনি বার্লিন যাত্রা করেন।

যাত্রার প্রাক্কালে, কথিত আছে, উত্তমচাঁদ সুভাষচন্দ্রকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এতবড় বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দেশত্যাগ করছেন কেন? এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন শুধু একটি কথা—"Danger is the breath of my life." এই একটি কথার মধ্যেই কি আভাসিত হয়নি সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবী-চরিত্র?

অতঃপর সুভাষচন্দ্রের জীবনে আরম্ভ হোল এক নূতন অধ্যায়—"জয় হিন্দ" অধ্যায়। ১৯৩৯ সাল থেকেই ভারতবর্ষে যে বৈপ্লবিক চেতনা তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, তাকে না গান্ধী, না নেহরু, কেউই ঠিকমত ব্যবহার করতে সক্ষম হননি। একজনের অপরিসীম নিষ্ক্রিয়তা বা passivity আর অপরজনের গান্ধী-আনুগত্যই ছিল এর প্রধান অন্তরায়। সেদিন ভারতবর্ষে একজন মানুষই ছিলেন যিনি এই দুই ভাব থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি সুভাষচন্দ্র বসু। তিনিই ভারতের এই বৈপ্লবিক চেতনার ঐতিহাসিকতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং এই চেতনাকে ঠিকপথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই তো তিনি ঐ রকম অকল্পিত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন। তাঁর জীবনের সেই পরমক্ষণে ভাগ্য যে তাঁর অনুকূল ছিল, তা সুভাষচন্দ্রের নিরাপদ নিষ্ক্রমণ থেকেই প্রমাণিত হয়েছে। যেদিন তিনি দেশত্যাগ করেন, ভারতের মাটিতে সেইদিনই ব্রিটিশ শাসনের অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে এসেছিল।

—Let me welcome your Excellency Massotta, এই বলে সিনর মোজোটাকে বার্লিনে অভ্যর্থনা জানালেন রিবেনট্রপ। তিনি যখন মার্চ মাসে এখানে পৌছলেন তখন হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করেছেন এবং জুন মাসেই তাঁর সেই অভিযান শুরু হওয়ার কথা। য়ুরোপে

সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ সংঘ গঠনের ইতিহাস এইবার আমরা আলোচনা করব। ভারতবর্ষ থেকে চলে আসার পর য়ুরোপে তাঁর অবস্থানকাল ছিল ঠিক এক বছর দশমাস অর্থাৎ ১৯৪১-এর এপ্রিল থেকে ১৯৪৩-এর ৭ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এবং এই সময়েই তিনি সাময়িকভাবে একটি জাতীয় সরকার গঠন করেন এবং সেই সঙ্গে আজাদ হিন্দ বাহিনীও গঠিত হয়। তাঁর বিপ্লবী জীবনের এই অধ্যায়ের কাহিনী যেমন চমকপ্রদ তেমনি শিক্ষাপ্রদ। বৈদেশিক শক্তির সহায়তায় সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কি রকম অধ্যবসায় ও তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন, সেই বিস্ময়-কর ইতিহাস না জানতে পারলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বের প্রকৃত মহিমা কোথায়, তা বোঝা যাবে না। তাঁর অজ্ঞাতবাসেব ইতিহাস দুই পর্বে বিভক্ত; প্রথম পর্ব—য়ুরোপ; দ্বিতীয় পর্ব—পূর্ব-এশিয়া। প্রথম পর্বেব ইতিহাস আগে বলি।

জার্মানিতে আসার কয়েক দিন পরের কথা।

বার্লিনে তখন অনেক নামকরা ভারতীয় থাকতেন। তাঁরা সকলেই একদিন একখানি নিমন্ত্রণলিপি পেলেন এবং সেটি পেয়ে তাঁরা বিস্মিত হলেন। নিমন্ত্রণ কর্তা সিনর ওর্ল্যাণ্ডো মোজোটা; এই বিচিত্র নাম তাঁরা আগে কখনো শুনেছেন বলে মনে হোল না। নিমন্ত্রণলিপিতে লেখা ছিল যে তিনি বার্লিন-প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গলাভের ইচ্ছা প্রকাশ কবে চায়ের নিমন্ত্রণ পাঠালেন; ঠিকানা দেওয়া ছিল ৬নং সোফিনট্রাস। এই ঠিকানাটি তাঁদের পবিচিত। কেন না আগে এইখানে বার্লিনস্থ ব্রিটিশ দূত অবস্থান করতেন। যাইহোক, যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ভারতীয়গণ সেই ভবনে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিলেন সুস্পষ্ট হিন্দুস্থানীতে, দীর্ঘবাহু—সুঠাম দেহ অতি প্রিয়দর্শন একটি ভদ্রলোক। চোখে চশমা, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক চেহারা। সকলেই তাঁকে দেখে তাঁর প্রতি কি যেন একটা আকর্ষণ বোধ করলেন।

—আমি সিনর মোজোটা নই, সুভাষ বোস, পরিষ্কার হিন্দুস্থানীতে এই কথা বলে নিমন্ত্রণকর্তা উপস্থিত সকলকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন এবং নিজের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করলেন।

সুভাষ বোস! এ নাম তাঁদের অতি পরিচিত—এ যে তাঁদের প্রিয় নেতার নাম। সকলেই চমৎকৃত হলেন। ভাবাবেগে কিছুক্ষণ সবাই নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সুভাষচন্দ্র বললেন: "আপনারা সংবাদপত্রে পড়েছেন যে আমি ভারত ত্যাগ করে চলে এসেছি। আমি এখানে এসেছি বিদেশ থেকে ভারতকে স্বাধীন করার সংগ্রাম চালাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। আপনারা আমার এই সংকল্প সাধনে নিশ্চয়ই সহায়তা করবেন।"

তাঁর মুখের উচ্চারিত প্রতিটি কথায় ফুঠে উঠল দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। উপস্থিত সকলেই অভিভূত হলেন সেই কথা শুনে এবং তাঁরা তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সুভাষচন্দ্র যে সময়ে বার্লিনে এসে উপস্থিত হলেন, তখন লিবিয়া রণাঙ্গনে বহুসংখ্যক ভারতীয় সৈন্য জার্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। এইসব যুদ্ধবন্দীর দল যখন শুনল যে, সুভাষচন্দ্র তখন য়ুরোপে এবং তিনি একটি ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সংগঠন করে ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে চান, তখন তারা উল্লসিত হয়ে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত 'স্বাধীন ভারতীয় বাহিনীতে' যোগদান করার জন্য ব্যস্ত হোল। এই ভারতীয় বাহিনী গঠন করার পূর্বে য়ুরোপে, বার্লিনে একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করে তিনি আজাদ হিন্দ সংঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। য়ুরোপ-প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগদান করেন তাঁর নাম আবিদ হাসান। হাসান পরে তাঁর সঙ্গে একই সাবমেরিনে পূর্ব-এশিয়ায় এসেছিলেন এবং আজাদ হিন্দ

ফৌজের লেফ্‌টেনেন্ট-কর্ণেলের পদে উন্নীত হয়েছিলেন। হাসান বার্লিনে সুভাষচন্দ্রের প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করতেন। কিছুকাল পরে ভিয়েনা থেকে শ্রীমতী শেঙ্কেলও এসে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে যোগদান করেন তাঁর প্রধান সেক্রেটারি রূপে। এইভাবে ১৯৪২, জানুয়ারি মাসের মধ্যেই তিনি পঁচিশ জন ভারতীয় সহকারী নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। তখন তাঁর সংগঠনের নাম ছিল 'Indian Independence Leauge' অথবা 'Free India Centre.' সবাইকে তিনি এইখানে কাজে নিয়োগ করেন। আরম্ভ হোল বেতারে প্রচার কার্য। ১৯৪১ সালে আজাদ হিন্দ রেডিও নিয়মিত ভাবে প্রচার কার্য শুরু করে। ভারতবর্ষ ত্যাগ করার পূর্বে সুভাষচন্দ্র একটি গুপ্ত বেতার সংযোগের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন যার মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষের সংবাদ পেতেন।

সুভাষচন্দ্রের তখনকার কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর ইংরেজ জীবনচরিতকার লিখেছেন: "Bose was a good master. He showed great interest in individual work and was full of fresh ideas. He was generous too, and sympathetic in solving the personal problems which beset his staff.... Unrelaxed, unrelenting, he drove his workers hard, and some were not a little afraid of him."

এইখানে আমরা যে চিত্র পাই, নিঃসন্দেহে তা এক মহান্ কর্মীর চিত্র। যেদিন থেকে তিনি বিপদসঙ্কুল পথে যাত্রা করেছিলেন সেদিন থেকে তাঁর মনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ভিন্ন অন্য কোনো চিন্তা স্থান পায়নি। প্রবাসী ভারতীয়দের এবং ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের অকুণ্ঠ আনুগত্য দেখে তিনি যারপরনাই অভিভূত হলেন। যেদিন বার্লিনের মাটিতে স্বাধীন ভারতের প্রথম বাহিনী গঠিত হোল সেদিন তাঁর বহুদিনের পোষিত স্বপ্ন চরিতার্থ হয়। সেদিন প্রত্যেক

সৈন্যকে একটি করে ফুল উপহার দিয়ে তিনি যখন বললেন: "আজ আমি নির্বাসিতের জীবন যাপন করছি—এর অধিক কিছু তোমাদের দেওয়ার সামর্থ্য আমার নেই।"—তখন সেই নবগঠিত স্বাধীন ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে যে উদ্দীপনার সঞ্চার লক্ষিত হয়েছিল তা শুধু কল্পনা করা যেতে পারে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ১৯৪২ থেকেই সুভাষচন্দ্র বেশি করে পরিচিত হতে থাকেন এবং তখন থেকে প্রবাসী ভারতীয়দের বিবিধ অনুষ্ঠান ও পার্টিতে তিনি যোগদান করতেন। এইসব পার্টিতেই সর্বপ্রথম 'জয় হিন্দ্' ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। তখন থেকেই এই 'জয় হিন্দ্' শ্লোগান ভারতীয় বাহিনীর জয়ধ্বনিতে পরিণত হয়। তখন থেকেই সুভাষচন্দ্র সকলের কাছে 'নেতাজী'—এই সম্মানিত নামে অভিহিত হতে থাকেন।

বার্লিনের পর রোম ও প্যারি শহরে ফ্রী ইণ্ডিয়া সেণ্টার স্থাপিত হয়। উত্তর আফ্রিকার রণাঙ্গন থেকে ধৃত ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দীদের নিয়ে গঠিত আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সংখ্যা তখন পাঁচ হাজারে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে যুদ্ধের গতি তীব্র হয়ে উঠল। জাপান পার্লহার্বার বন্দর আক্রমণ করল এবং অবশেষে সিঙ্গাপুর পতনের সংবাদ যখন বার্লিনে পৌঁছল তখন সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি পূর্ব-এশিয়ার দিকে নিবদ্ধ হোল। খবর এলো রেঙ্গুনের পতন হয়েছে। সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন এবং কলিকাতা—ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের তিনটি প্রধান কেন্দ্র। দুটির পতন হয়েছে এবং এর থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ পতন যে আসন্ন এবং সুনিশ্চিত তা বুঝতে সুভাষচন্দ্রের বিলম্ব হোল না।

সিঙ্গাপুর পতনের সংবাদে উল্লসিত হয়ে তিনি প্রথম যে বেতার ভাষণ দিলেন তাতে তিনি বললেন: "I have waited silently and patiently on the course of events; now that the hour has struck, I can come forward and speak.... In this struggle, and in this subsequent

period of reconstruction we will co-operate whole-heartedly with all those who help us to destroy the common enemy." (বেতার ভাষণ, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২।)

এই বেতার ভাষণেই সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটি একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই প্রসঙ্গে গোয়েবলস্ তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন যে, ফ্যুয়েরার (হিটলার) ও আমরা সবাই বোসের এই ঘোষণায় উৎসাহ বোধ করেছিলাম। সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয় বেতার ভাষণ শোনা গেল ১৩ই মার্চ, ১৯৪২। যুদ্ধের অবস্থার ক্রমাবনতি দেখে ভারতীয়দের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য পার্লামেণ্ট থেকে লর্ড প্রীতিসিল ও হাউস অব কমন্সের নেতা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে বিশেষ দৌত্যকার্যে ভারতে প্রেরণ করা হোল। ব্রিটিশ সমর পরিষদের সম্মতিক্রমে তিনি এক নূতন প্রস্তাব নিয়ে এলেন। তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা কুখ্যাত সাম্রাজ্যবাদী উইনস্টন চার্চিল। ক্রীপস-প্রস্তাবের বিস্তারিত আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নেই। এর মূল বক্তব্য ছিল যে, যুদ্ধের শেষে ভারতবাসীকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হবে। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের এই আশ্বাসবাণী বা প্রতিশ্রুতিতে কংগ্রেস আস্থা স্থাপন করতে পারল না। গান্ধী স্বয়ং এই প্রস্তাবকে সেদিন একটি "Post-dated cheque on a crashing bank" বলে অভিহিত করেছিলেন। শুধু কংগ্রেসই নয়, ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দলই ক্রীপস-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ক্রীপস এদেশে পৌঁছবার আগেই ১৩ই মার্চের বেতার ভাষণে সুভাষচন্দ্র ভারতবাসীকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তখন থেকেই বার্লিন রেডিওতে তাঁর বেতার বক্তৃতা ভারতের জনগণ দিনের পর দিন উৎসুক আগ্রহে শুনতে থাকে। সুভাষচন্দ্র তাঁর বেতার

ভাষণে বলেছিলেন : "The Mission is meaningless, how can a man of Sir Stafford's liberalism and well-known hatred of imperialism undertake so cynical a task ? It is an insult to India. Let the British rather adopt General Tojo's policy, now twice proclaimed, of India for the Indians, and quit."

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঐ একই সময়ে টোকিও রেডিও থেকে ভারতবাসীর উদ্দেশে স্বনামধন্য বিপ্লবী রাসবিহারী বসু একই কথা বলেন। ভারতে পক্ষাধিককালব্যাপী ক্রীপস-দৌত্যের ব্যর্থতার মূলে সুভাষচন্দ্র ও রাসবিহারীর বেতার বক্তৃতার যে কিছুটা প্রভাব ছিল তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। এইবার এই দুই বিপ্লবী মহানায়কের মিলনের লগ্ন আসন্ন হয়ে এলো।

এইসময় ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে একটি ত্রিশক্তি ঘোষণার (Tripartite declaration) প্রস্তাব জাপান করল এবং পূর্ব-এশিয়ায় এসে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য সে সুভাষচন্দ্রকে আহ্বান জানাল। সুভাষচন্দ্র দেখলেন এই তো পূর্ণ সমর্থন ( তাঁর নিজের কথায়, "solid support") পাওয়া গিয়েছে। অবিলম্বে তিনি অক্ষশক্তির অধিনায়ক হিটলার ও মুসোলিনীকে ঐ প্রস্তাব অনুসারে কাজ করার জন্য আবার সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন। বার্লিনে পৌঁছে অবধি তিনি হিটলার ও মুসোলিনীকে এই কথা অনেকবার বলেছেন ; কিন্তু "সময় আসেনি" এই ওজুহাতে তাঁরা তাঁর অনুরোধে কর্ণপাত করেননি। এখন পূর্ব-এশিয়ার যুদ্ধের গতি অন্যরূপ নিয়েছে ; তোজো স্বয়ং ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন।

সুভাষচন্দ্র রোমে এসে মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

ত্রিশক্তি ঘোষণার স্বপক্ষে সুভাষচন্দ্রের যুক্তি তিনি স্বীকার করলেন এবং তিনি এই বিষয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য হিটলারকে অনুরোধ করে এক তারবার্তা পাঠালেন। কিন্তু হিটলার রাজী হলেন না। ১১ই মে তারিখের দিনলিপিতে গোয়েবলস লিখছেন: "We do not think the time has yet come for such a political manoeuvre". হিটলারও অনুরূপ মত পোষণ করতেন। সুভাষচন্দ্র তাঁদের এই মত পরিবর্তনে অক্ষম হলেন। ২৯শে মে তিনি যখন নাৎসী-নায়কের হেড-কোয়ার্টারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন সুভাষচন্দ্র হিটলারকে এই কথাগুলি বলেছিলেন: "With my popularity and contacts in India, I can rouse the country by propaganda from outside. Never has India been so near the brink of revolt, a mere push will send her over." এর উত্তরে হিটলার তাঁকে বললেন: "কয়েক সহস্র সুসজ্জিত সৈন্য দ্বারা কোটি কোটি নিরস্ত্র বিপ্লবীকে সংযত রাখা যায়। তার দরজায় যতক্ষণ পর্যন্ত একটি বৈদেশিক শক্তি আঘাত না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতে কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন আশা করা যায় না।" তারপর তিনি দেওয়ালে বিলম্বিত একটি মানচিত্রের কাছে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে এসে বললেন: "It will be foolish to make a declaration about India now ; the world will regard it as premature even from me. No, the time for an annoucement about India is still far off."

তবে কি দেশত্যাগ করে তিনি ভুল করেছেন?—ভাবলেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু এখন তো আর ফিরে যাওয়ার পথ নেই। সেই সংকটমুহূর্তে তিনি পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের নেতৃত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত করলেন। ১৯৪৩, ২৬শে জানুয়ারি। বার্লিনে 'স্বাধীনতা দিবস' উৎসব পালন করার পর সুভাষচন্দ্র পূর্ব-এশিয়ার অভিমুখে

সাবমেরিনে যাত্রা করেন। যাওয়ার আগে তিনি নাম্বিয়ারের ওপর সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করে যান।

য়ুরোপ-প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন শ্রী এ. জি. এন. নাম্বিয়ার। তিনি একজন দক্ষ সাংবাদিক ছিলেন। য়ুরোপে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের দুটি বিভাগ ছিল—সামরিক ও অসামরিক; অসামরিক ভাবেও সঙ্ঘ য়ুরোপে অবস্থিত সমস্ত ভারতবাসীকে একই ত্রিবর্ণ পতাকার তলে সঙ্ঘবদ্ধ করেছিল এবং এই সঙ্ঘের শাখা য়ুরোপের প্রধান প্রধান শহরে স্থাপিত হয়েছিল, সে কথা আগেই বলেছি। জাতীয় কংগ্রেসের সবুজ, সাদা ও গেরুয়া রঙের চরকা-লাঞ্ছিত পতাকা ঈষৎ পরিবর্তিত করেই সুভাষচন্দ্র একটি নূতন পতাকা সৃষ্টি করেছিলেন। রঙ তিনটি ঠিকই ছিল, কেবল চরকার বদলে লম্ফ প্রদানে উদ্যত একটি ব্যাঘ্র দেওয়া হয়। এই ব্যাঘ্র-কেতনই ছিল আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় পতাকা।

নাম্বিয়ার আঠার বছর ধরে য়ুরোপে আছেন এবং একজন বামপন্থী সাংবাদিক বলে খ্যাত ছিলেন। সুভাষচন্দ্র তাঁকে আগে থেকেই চিনতেন। সুভাষচন্দ্র য়ুরোপে আসার পর থেকেই তিনি তাঁর সঙ্গে মিলিত হন এবং সঙ্ঘের প্রধান নায়ক রূপে নিযুক্ত হন। অতঃপর তিনি সঙ্ঘের ডেপুটি লীডার বলে পরিচিত হন। আজাদ হিন্দ সঙ্ঘের অসামরিক বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁরই ওপর দেওয়া হয়। সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে যাত্রা করার পূর্বে সুভাষচন্দ্র ফ্রী ইণ্ডিয়া সেণ্টারের (যা তখন জার্মানীতে বৈদেশিক দূতাবাসের মর্যাদা পেয়েছিল) সকল দায়িত্ব নাম্বিয়ারের ওপর ন্যস্ত করেন। বার্লিন পতনের পর নাৎসী শক্তি ছত্রভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত নাম্বিয়ার আজাদ হিন্দ্ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে কাজ চালাতে থাকেন।



হে ভারতীর মহাবীর
লহ মোদের নমস্কার।

৯

১৯৪৩। ২রা জুলাই।

সুভাষচন্দ্র টোকিও থেকে সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছলেন।

এইবার আরম্ভ হোল তাঁর অজ্ঞাতবাসের দ্বিতীয় পর্ব এবং আমরা দেখতে পাই যে এই পর্বে নেতাজী রূপে তিনি এক অদ্বিতীয় কীর্তি স্থাপন করেন। একাদিক্রমে নব্বই দিন বিপদসঙ্কুল জলপথ অতিক্রম করে নেতাজী নিরাপদে সুমাত্রা ও পেনাঙ এসে পৌঁছলেন জুনের গোড়াতেই। ৮ই ফেব্রুয়ারি হাসানকে সঙ্গে নিয়ে একটি জার্মান U-বোটে চড়ে তিনি কিয়েল বন্দর থেকে যাত্রা করেন। তারপর তাঁরা উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে অতলান্তিক মহাসমুদ্রে এসে পড়েন এবং সমগ্র অতলান্তিক মহাসমুদ্র অতিক্রম করে মাদাগাস্কার থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে চারশো মাইল দূরবর্তী একটি স্থানে অবতরণ করেন। এইখানে ২৮শে এপ্রিল তাঁরা রবারের ডিঙি নৌকায় চড়ে জাপানী সাবমেরিন I 29-এর আরোহী হন। সমগ্র ভারত মহাসমুদ্র তাঁরা এইভাবে অতিক্রম করতে সক্ষম হন। অবশেষে নেতাজী সুমাত্রার উত্তরে সাবাং এসে পৌঁছলেন। এইখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন কর্নেল ইয়ামামোতো। বার্লিনে ইনি যখন জাপান সরকারের মিলিটারি এ্যাটাচি রূপে নিযুক্ত ছিলেন তখনই নেতাজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং এই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বার্লিন থেকে জাপান আসার ব্যাপারে কর্নেল ইয়ামামোতোই তাঁকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিলেন। 'Hikari kikan' নামে তখন জাপ-ভারত সংযোগের জন্য যে সংস্থাটি গড়ে উঠেছিল কর্নেল ইয়ামামোতো ছিলেন তারই সর্বময় কর্তা। ইয়ামামোতো টোকিও থেকে চলে এসে সেখানে নেতাজীর আগমন প্রতীক্ষা করছি[illegible] এবং তাঁর সঙ্গে একত্রে তিনি টোকিও যাত্রা করেন। ১৩ [illegible] কিও

এসে পৌঁছলেন। সুতরাং ৮ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ই জুন হিসাব করলে দেখা যাবে যে আঠার সপ্তাহ লেগেছিল নেতাজীর টোকিও পৌঁছতে। এইটাই ছিল তাঁর জীবনে সবচেয়ে দুঃসাহসিক অভিযান।

সেই যে একদিন গভীর রাত্রে তিনি 'দিল্লী চলো' সংকল্প নিয়ে কলকাতা থেকে দেশত্যাগী হয়েছিলেন—পরাধীনতার অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতার পথ লক্ষ্য করে ছুটে ছিলেন—নেতাজীর সেই ঐতিহাসিক অভিযান একে একে পেশোয়ার, কাবুল, মস্কো, বার্লিন, সুমাত্রা, পেনাঙ, টোকিও, সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, মেমিও, টামু, প্যালেল, কোহিমা, ইম্ফল প্রভৃতি পথ পরিক্রম করে সার্থকতা লাভ করেছিল। ভাগ্যচক্রের বিবর্তনে নেতাজী স্বয়ং দিল্লী এসে পৌঁছননি, তাঁর বিজয়ী আজাদ হিন্দ বাহিনীও দিল্লী এসে পৌঁছতে পারেনি—তারা এলো বন্দীরূপে দিল্লীর লাল কেল্লায়। বন্দীরূপে সেদিন যারা এসেছিল তাদেরই বন্দনায় মুখরিত হোল সারা ভারতবর্ষ—.সদিন "হাজার কণ্ঠে 'নেতাজীর জয়' ধ্বনিয়া তুলেছে দিক্।" ইতিহাসের অলিন্দে প্রতিহত হয়ে সেই ধ্বনি বিসর্পিত হোল দূর কালের দিকে। কালের প্রান্তর অতিক্রম করে আজো তাই আমরা শুনি 'জয়তু নেতাজী'। সেই জয়ের সম্পূর্ণ কাহিনী একদিন রচনা করবেন ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক। অতঃপর আমরা তাঁর অজ্ঞাতবাসের দ্বিতীয় পর্বের বর্ণাঢ্য ইতিহাস আলোচনা করব।

সুভাষচন্দ্র জানতেন ভারতের চল্লিশ কোটি নরনারীর মুক্তির জন্য যখন যেখানে তাঁর নেতৃত্বের প্রয়োজন অপরিহার্য হবে, তখনই তিনি সেখানে এগিয়ে আসবেন। সেই প্রয়োজন দেখা দিল পূর্ব-এশিয়া[illegible] ·৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিঙ্গাপুর পতনের পর [illegible] ায় একটি নূতন কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ১৫ই

ফেব্রুয়ারি, ১৯৪২। সিঙ্গাপুরের পতন হোল। যে সিঙ্গাপুরের দুর্ভেদ্যতা সম্পর্কে এতদিন এত কথা শোনা গিয়েছিল, আজ তা যেন তাসের ঘরের মতোন পড়ে গেল জাপানী আঘাতের প্রচণ্ড ধাক্কায়। ব্রিটিশের এই দুর্ভেদ্য ঘাঁটির পতনে সেদিন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীরূপে চার্চিল যে বিলাপধ্বনি করেছিলেন তা হয়ত অনেকের স্মরণ আছে। পঞ্চাশ হাজার সামরিক ও বেসামরিক ভারতীয়দের একান্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখেই ইংরেজরা চলে এসেছিল। পরে জানা যায় যে, ব্রিটিশ সৈন্য পূর্বাহ্নেই পলায়ন করে এবং তাদের এই পশ্চাদপসরণের সকল ব্যবস্থাই আগে থেকে করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদের কিছু না জানিয়ে তাদের অনিশ্চিত ভাগ্যের ওপর ফেলে রাখা হয়। ফলে তারা বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এইসব সৈন্য এবং প্রবাসী ভারতীয়গণের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব জাপানীদের কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে ১৭ই ফেব্রুয়ারি জাপানী সমর শিবিরের ভারপ্রাপ্ত অফিসার মেজর ফুজিয়ারা কয়েকজন ভারতীয়কে আমন্ত্রণ করে পাঠালেন। কিন্তু তাঁরা ফুজিয়ারার এই আবেদনে সাড়া দিলেন না। তাঁরা বুঝেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা ভারতের ভিতরে এবং বাহিরে ভারতীয়গণের দ্বারাই অর্জন করতে হবে। তাঁরা বুঝেছিলেন, একমাত্র ভারতীয় স্বাধীন বাহিনীরই মুক্তিফৌজ হিসাবে ভারতপ্রবেশের অধিকার আছে; কোনো বৈদেশিক শক্তির বা বৈদেশিক বাহিনীর সে অধিকার নেই—থাকতে পারে না।

১৯৪২, মার্চ মাস। মালয়ের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সিঙ্গাপুরে একটি সভা করলেন। ইতিমধ্যে জাপান-প্রবাসী স্বনামধন্য বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু *

*প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ইনি ভারতে সন্ত্রাসবাদীদলের অন্যতম নেতা ছিলেন এবং ১৯১৬ সালে ভারতে বিপ্লব চেষ্টা ব্যর্থ হলে রাসবিহারী কলিকাতা থেকে ছদ্মবেশে জাপান পালিয়ে যান। অতঃপর তিনি জাপানী নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন এবং একটি জাপানী মেয়েকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করে সেইখানেই বসবাস করতে থাকেন এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করেন।

শ্যামদেশে একটা প্রতিনিধি সম্মেলন আহ্বান করেন। সিঙ্গাপুরের সভায় স্থির হোল যে টোকিওতে একটি শুভেচ্ছা দল পাঠানো হোক। এরপর রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে টোকিওতে আর একটা সম্মেলন বসে। এই সম্মেলনে শুভেচ্ছাদলের প্রতিনিধিবৃন্দ ভিন্ন হংকং, সাংহাই ও জাপান প্রবাসী ভারতীয় প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হোল যে পূর্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়গণের পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করার এই প্রকৃতই সময়। এই স্বাধীনতা হবে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সকল রকম বৈদেশিক শাসন ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি। ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান এবং ক্রিয়াকলাপের অধিকারী হতে পারবে কেবলমাত্র ভারতীয় নেতৃত্বে ও ভারতীয় স্বার্থে চালিত স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী। সকল ক্ষমতা পরিচালিত হবে ভারতীয় তত্ত্বাবধানে। এই স্মরণীয় সম্মেলনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবটি ছিল এই: "ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করার অধিকার ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ওপর ন্যস্ত থাকবে।"

এরপরের পটভূমিকা ব্যাঙ্কক।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, পূর্ব-এশিয়ায় জাপানের জয়লাভের পর প্রত্যেক স্থানে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ (Indian Independence League) গঠিত হয়। জাপান, ফিলিপাইন, কোরিয়া, মানচুরিয়া, সাংহাই, হংকং, ইন্দোচীন, নানকিন, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া এবং আন্দামানের সঙ্ঘগুলি ১৯৪২ সালের ১৪ই জুন থেকে ২৩শে জুন পর্যন্ত ব্যাঙ্ককে একটা প্রতিনিধি সম্মেলনে মিলিত হয়। এই সম্মেলনে একশতজন প্রতিনিধি সমবেত হন। রাসবিহারী বসু এই স্মরণীয় সম্মলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। সিঙ্গাপুর ছিল এই সঙ্ঘের প্রধান কর্মস্থল। পূর্ব-এশিয়ার সমস্ত দেশেই এর একটি করে শাখা স্থাপিত হয়েছিল। এই ব্যাঙ্কক

কনফারেন্সের সংবাদ বার্লিনে বসে সুভাষচন্দ্র পেয়েছিলেন। একটি শুভেচ্ছা বাণীতে তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন: "একটি সঙ্ঘের অধীনে জাতীয়তাবাদী সমস্ত প্রবাসী ভারতীয়দের সংহত করার সময় উপস্থিত; অপরের প্রয়াসের ওপর আমরা আর নির্ভর করব না; আমরা নিজেদের চেষ্টাতেই স্বাধীনতা অর্জন করব।" তখন থেকেই এখানে সকলের মুখে মুখে 'নেতাজী' এই নামটি ফিরতে থাকে। এর এক বছর পরেই পূর্ব-এশিয়ার রণাঙ্গণে তাঁর বহু-প্রত্যাশিত আবির্ভাব ঘটল।

এই ব্যাঙ্কক সম্মেলনেই কার্যপদ্ধতি স্থির হয় এবং একটি কর্মপরিষদ ( Council of Action ) গঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন রাসবিহারী বসু এবং সভ্য ছিলেন চারজন, যথা—এন. রাঘবন, কে. পি. কে. মেনন, ক্যাপ্টেন মোহন সিং এবং কর্ণেল জিলানী। অতঃপর এই কর্মপরিষদ ইতিহাস-বিখ্যাত I. N. A. বা ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গঠন করার ভার গ্রহণ করেন। এইসব সংবাদে পূর্ব-এশিয়ার সর্বত্র অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য এবং অদম্য কর্মোৎসাহ দেখা গেল। এই পরিস্থিতিতেই ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর অধিনায়কত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের গঠন কার্য আরম্ভ হয়। হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে চঞ্চল মুহূর্তে কাজ শুরু করতে হয়। মালয়ে যেসব ভারতীয় সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছিল তাদের নিয়েই বাহিনী গঠনের প্রাথমিক কর্মসূচী অনুসৃত হতে লাগল। দিকে দিকে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল।

সাম্রাজ্যবাদী জাপান কিন্তু এ জিনিস বরদাস্ত করতে পারল না। পূর্ব-এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে এই বিরাট জাগরণ তাঁরা প্রীতির চক্ষে দেখতে পারলেন না। ফলে জাপান সরকারের সঙ্গে, বিশেষ করে জাপানী সমরনায়কদের সঙ্গে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কর্ম-পরিষদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। সেই সংঘর্ষের বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু এইটুকু বললেই

যথেষ্ট হবে যে, যখন 'ইরাকুরো কিকান'-এর অফিসারগণ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতে আসেন, তখনই তিক্ততা চরমে উঠল। রাসবিহারী বসু এই ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। এত আয়োজন, উদ্যোগ এবং উৎসাহ সব বুঝি পণ্ড হয়ে যায়। অনতিবিলম্বে জাপান সরকারের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য তিনি একবার টোকিও যাওয়া সাব্যস্ত করলেন। আজাদ হিন্দ্ সম্বন্ধে জাপ সরকারের মনোভাবের একটা পরিষ্কার ঘোষণা প্রয়োজন।

এই পটভূমিকাতেই পূর্ব-এশিয়ায় নেতাজীর আবির্ভাব ঘটে এবং আজাদ হিন্দ্ বাহিনীতে এক নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। টোকিওতে এসে পৌঁছানর পরের দিনই প্রধান মন্ত্রী তোজোর সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি মিলিত হলেন। উভয়ের মধ্যে খোলাখুলিভাবেই আলোচনা হয় এবং স্বাধীনতা অর্জনে ভারতীয়দের প্রয়াসে জাপান সাহায্য করবে—তোজো এই প্রতিশ্রুতি দিলেন নেতাজীকে এবং জাপ পার্লামেন্টে ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে তোজো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা প্রদান করলেন। "Japan is firmly resolved to extend all means in order to enable India to achieve full independence in the true sense of the term."—এমন আশ্বাসের কথা তিনি হিটলার বা মুসোলিনীর মুখ থেকে শোনেন নি। "ইহা একটি যুগান্তকারী ঘোষণা, ইহা ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য"—সেদিন এই কথা বলেছিলেন নেতাজী।

অতঃপর তিনি রাসবিহারী বসুর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং তাঁর কাছ থেকে লীগ ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অবগত হলেন। জাপান সমর বিভাগের সঙ্গেও তিনি আলোচনা করলেন এবং ১৯শে জুন একটি সাংবাদিক বৈঠকে তিনি যোগদান করলেন। তারপরেই পৃথিবীর লোককে, বিশেষ করে ভারতবাসীকে

পূর্ব-এশিয়ায় তাঁর আবির্ভাবের বার্তা জানাবার জন্য তিনি দুটি বেতার ভাষণ দিলেন; তার একটিতে তিনি বললেন: "Indian liberty must be won with Indian blood.... India shall be free and before long. And a free India will throw open the prison gates so that her worthy sons may step out of the darkness of the prison cells into the light of freedom, joy and self-fulfilment"

এই ছিল সেদিন এশিয়াতে নূতন কণ্ঠস্বর।

সেই সময়ে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন হয়েছে। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট বোম্বাইতে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে একটি স্মরণীয় প্রস্তাব নিয়ে এলেন গান্ধী। ইহাই 'Quit India' বা 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব। ৮ই আগস্ট দিবাবসানে প্রস্তাব গৃহীত হোল। পরদিন প্রত্যুষেই অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়। মুহূর্তমধ্যে এই সংবাদ দাবানলের মতোন সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতব্যাপী এক অভূতপূর্ব বিদ্রোহ এবং বিক্ষোভ শুরু হয়। মনে হোল যেন আসমুদ্র-হিমাচল প্রকম্পিত করে যুগ যুগ সঞ্চিত অসন্তোষ ও বিক্ষোভের আগ্নেয়গিরি মুহূর্তমধ্যে বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে আরম্ভ হোল বিদ্রোহের অগ্নি উদ্গীরণ। ইহাই ঐতিহাসিক আগস্ট বিপ্লব। ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে আগস্ট বিপ্লবের অমরকাহিনী চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত জাতি সেদিন ব্রিটিশের শাসন-শৃঙ্খল চূর্ণ করবার জন্য নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতির বাইরে গিয়ে সক্রিয় প্রতিরোধের সাধনমন্ত্রে জেগে উঠেছিল। বাইরে থেকে এই অভ্যুত্থানের সংবাদ পেয়ে সেদিন একে অভিনন্দন জানিয়ে নেতাজী বলেছিলেন: "In the history of India's

struggle, August, 1942 will remain an unforgettable landmark, indicating the psychological transition from passive to active resistance."

আগস্ট বিপ্লবরূপ গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লবের হোমানলে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তাঁদের তিনি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন এবং যাঁরা ইংরেজের কারাগারে বন্দী-জীবন যাপন করছিলেন তাঁদের মুক্তির কথাই নেতাজীর টোকিও বেতার ভাষণে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব।

২রা জুলাই, ১৯৪৩।

টোকিও থেকে নেতাজী সিঙ্গাপুরে এলেন। সেখানে তিনি বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন। সে যেন মহাকাব্যের এক নায়কের আবির্ভাব। যে যেখানে ছিল—পুরুষ, নারী ও শিশু—সকলে দলে দলে এগিয়ে এলো তাঁদের বহু-প্রত্যাশিত নেতাজীকে অভ্যর্থনা করতে। সেই উদ্বেলিত জনসমুদ্রের সম্মুখে তিনি যখন এসে অভিবাদন করে দাঁড়ালেন, মনে হোল জাতির পরিত্রাণকর্তা স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন বরাভয় নিয়ে। উন্নত, দীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত ললাট, ললাটে জয়ের তিলক, গভীর দৃষ্টিপূর্ণ আয়ত দুই চক্ষু, চশমার পুরু কাচের ভিতর দিয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার দৃষ্টি, সুদৃঢ় সংকল্পে উদ্দীপ্ত তাঁর মুখমণ্ডল আর কঠিন ইস্পাতের মতোন অনমনীয় ব্যক্তিত্ব। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস আর স্পন্দিত হৃদয়ে সকলে জানাল তাঁকে অভিবাদন। সমস্ত ভয় ভাবনা, নিরাশা দূর হয়ে গেল তাঁকে দেখা মাত্র। মনে হোল, এতদিন পরে বুঝি তারা পেয়েছে তাদের ঈপ্সিত নেতাকে—সকলের অন্তর এই কথায় সায় দিয়ে উঠল। সমস্ত হৃদয় দিয়ে তারা সুভাষচন্দ্রকে স্বীকার করে নিল তাদের 'নেতাজী' বলে। হাজার কণ্ঠে উঠল জয়ধ্বনি—'নেতাজীর জয়'।

৪ঠা জুলাই। পূর্ব-এশিয়ার স্বাধীনতা সঙ্ঘের সমাগত পাঁচ

হাজার প্রতিনিধির সামনে তিনি গ্রহণ করলেন লীগের নেতৃত্ব আর জাতীয় বাহিনীর আনুগত্য। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তিকে শেষ আঘাত হানবার জন্য সকলকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানালেন তিনি। বললেন: "আমাদের সম্মুখে তীব্র সংগ্রাম—কারণ শত্রু শক্তিশালী, অবিবেচক ও নিষ্ঠুর। এই আমাদের স্বাধীনতার শেষ অভিযানে তোমাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখভোগ এমন কি, মৃত্যু পর্যন্ত স্বীকার করতে হবে। এই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই স্বাধীনতা তোমাদের করতলগত হবে।"

৫ই জুলাই। সিঙ্গাপুর টাউনহলের বিপরীত দিকে প্রশস্ত ময়দানে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী বা I. N. A. সমবেতভাবে নেতাজীকে অভিবাদন জানাল এবং সরকারীভাবে এই বাহিনীর সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করে এর অস্তিত্ব তিনি ঘোষণা করলেন পৃথিবীতে। এইটাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে গর্বের দিন। এই সেনাবাহিনী তিনি পরিচালনা করে নিয়ে যাবেন ভারতে এবং সেইখানে এদের আবির্ভাবে ঘটবে সর্বশেষ বিপ্লব ও বিদ্রোহ। 'চলো দিল্লী'—এই রণধ্বনি দিলেন তিনি তাদের কণ্ঠে। দিল্লীর লাল কেল্লায় বিজয়ী সৈন্যের কুচ-কাওয়াজে পরিসমাপ্ত হবে এই অভিযান। এই বাহিনীর দুইটি দায়িত্ব; প্রথম—স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা; দ্বিতীয়—স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসাবে কাজ করা। এইসব কথা বলার পর সবশেষে নেতাজী বললেন: "যদি তোমরা আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাদের জয় ও স্বাধীনতার পথে নিয়ে যাব। কঠোর শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে যে কোনো ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের সম্মুখে আজ অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।"

বক্তৃতা তো নয়, যেন বহ্নিদীপ্ত আহ্বান। বাক্য নয়—সঞ্জীবনী মন্ত্র। সেই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল তারা। হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হোল—নেতাজীর জয়!

৬ই জুলাই।

জাপান থেকে তোজো এসে জাতীয় বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করলেন। ভারতকে স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করার শপথ তিনি আর একবার উচ্চারণ করলেন তাদের সামনে।

৯ই জুলাই। সেদিন তুমুল বৃষ্টি। সেই বর্ষণের মধ্যে দাঁড়িয়ে ষাটহাজার লোক শুনল: "যে বহুমুখী অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি, ভারতবর্ষে এমন কোনো জাতীয়তাবাদী নেতা নেই যিনি সেই অভিজ্ঞতা দাবী করতে পারেন। আমার লক্ষ্য সামগ্রিক যুদ্ধের জন্য সমগ্রভাবে সংহত হওয়া। আমি চাই তিন লক্ষ সৈন্য আর পাঁচকোটি টাকা।" এইভাবে প্রবল উদ্দীপনার মধ্যে প্রতিপালিত হোল 'নেতাজী সপ্তাহ'। সেদিন, ৫ই জুলাই, তাঁর অধিনায়কত্বে তিনি যখন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠনের কথা সারা পৃথিবীতে বেতারে ঘোষণা করেন, সেদিন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আতঙ্কে, বিস্ময়ে দূর থেকে এই সংবাদ শুনল। কেবলমাত্র জানতে পারল না তাঁর স্বদেশবাসী যে অজ্ঞাতবাসের অন্ধকার থেকে দিনের প্রখর আলোকে সুভাষচন্দ্র আজ আবির্ভূত হয়েছেন পূর্ব-এশিয়ায় আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্টের রাষ্ট্রাধিনায়করূপে।

আগস্ট মাসে তিনি রেঙ্গুনে এলেন ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করার জন্য। ঐসময়ে তিনি রেঙ্গুনে নির্বাসিত শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুরশাহের সমাধিভূমি পরিদর্শন করেন। তারপর তিনি ব্যাঙ্কক ও সায়গন পরিদর্শনে চলে গেলেন—সর্বত্রই তিনি দিলেন অজস্র বক্তৃতা আর সাক্ষাৎ করলেন বহুজনের সঙ্গে আর জাপানী সমরনায়কদের সঙ্গে মিলিত হলেন আলোচনা বৈঠকে এবং যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই দিয়েছেন বেতার-ভাষণ। এইসময়ে তিনি অশ্রান্তভাবে কাজ করেছেন, নিদ্রা ছিল অতি সামান্য আর গভীর রাত্রি পর্যন্ত তাঁকে কাজ করতে দেখা যেত। এইভাবেই সেদিন পূর্ব-এশিয়ায় রচিত হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতা

সংগ্রামের গরিমাময় এক নূতন কাব্য। সেই কাব্যের রচয়িতা ছিলেন—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

২১শে অক্টোবর, ১৯৪৩।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় তারিখ।

ঐদিন আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠিত হয়। নেতাজী জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়লাভ করতে হলে দুটি প্রতিষ্ঠানের অপরিহার্য প্রয়োজন আছে—প্রথম, একটি জাতীয় বাহিনী, দ্বিতীয়—একটি জাতীয় সরকার। এইবার তিনি সেই কাজে অগ্রসর হলেন। পূর্ব-এশিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের চারমাসের মধ্যেই নেতাজী কর্তৃক আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠন নিঃসন্দেহে তাঁর কর্মকুশলতার পরিচায়ক। সেইদিন থেকে ঘটনাপ্রবাহ যেন ঝটিকার বেগে প্রবাহিত হতে থাকে। শাহ্‌নওয়াজ, আয়ার প্রমুখ আজাদ হিন্দ্ সরকার সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সে ইতিহাস বিস্তারিতভাবে রচনা করেছেন। আজাদ হিন্দ্ সরকারের স্মরণীয় ঘোষণা ভারতের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সংযোজনা করল। সে ঐতিহাসিক ঘোষণার মধ্যে যেন দীর্ঘকালের অমারাত্রির অবসান হোল—পূর্ব দিগন্তে নব সূর্যোদয়ের নির্মল প্রকাশের মতোন সেই ঘোষণা জাতির প্রাণে নিয়ে এল এক নবীন স্পন্দন। ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত ব্যাঘ্র-কেতনের তলে উচ্ছ্বাস নিরুদ্ধ কণ্ঠে দাঁড়িয়ে নেতাজী সর্বপ্রথমে শপথ গ্রহণ করলেন এই বলে: "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই বিরাট ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে "আমি—সুভাষচন্দ্র বসু—আজ এই শপথ করছি যে আমার জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আমি আজাদ হিন্দ্ সরকারের সেবা করব এবং ভারতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা যতক্ষণ না আসবে ততক্ষণ আমি সংগ্রামরত থাকব। ঈশ্বর, স্বদেশ ও স্বজাতির নামে আমি এই শপথ গ্রহণ করলাম।"

অনুরূপ শপথ গ্রহণ করলেন নবগঠিত আজাদ হিন্দ্ সরকারের অন্যান্য মন্ত্রিগণ। তাঁরা প্রত্যেকে তাঁদের মর্যাদা অনুসারে নেতাজীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হোল—রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক'। জার্মানিতে অবস্থান কালে তিনি এই গানটিকেই জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁরই নির্দেশে এইটি এখন নূতন করে হিন্দুস্থানীতে রূপান্তরিত হয়ে আজাদ হিন্দ্ সরকারের জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা লাভ করল। তাঁরই নির্দেশে আজাদ বাহিনীর এক তরুণ সৈনিক—সম্বলপুরের তরুণ কবি হুসেন—এই অনুবাদ করেন ও সুর সংযোজনা করেন। জাতীয় সংগীত যখন গাওয়া হয়, তখন সকলেই সম্ভ্রমভরে দাঁড়িয়ে ছিলেন—নেতাজী, ইয়ামামোতো ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ। সকলেরই মনে হোল, স্বাধীনতার উদয় হোল। সেই উদ্দীপনাময় ক্ষণটির স্মৃতি সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দের জীবনে অক্ষয় হয়ে রইল।

এইবার নেতাজী একটি প্রাথমিক ঘোষণা পাঠ করলেন :

"স্বাধীনতা আজ আসন্ন। আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য হইল একটি অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট গঠন করা এবং সেই গভর্নমেণ্টের পতাকাতলে সমবেত হইয়া স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করা। কিন্তু ভারতের প্রত্যেক নেতা আজ কারাগারে, জনসাধারণও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এই অবস্থায় ভারতে একটি অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট গঠন করা বা সেই গভর্নমেণ্টের অধীনে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সেজন্য স্বদেশ ও বিদেশের সকল দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের সমর্থন লইয়া পূর্ব-এশিয়ায় আমরা স্বাধীন ভারতের এই অস্থায়ী গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিলাম এবং এই গভর্নমেণ্টের অধীনস্থ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সাহায্য লইয়া আমরা স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম পরিচালনা করিব।

"ভারতভূমি হইতে ব্রিটিশ ও তাহার মিত্রদের বিতাড়িত করিবার জন্য অস্থায়ী গভর্নমেণ্টকে সংগ্রাম চালাইতে হইবে।

ইহার পর অস্থায়ী গভর্নমেণ্টের কর্তব্য হইবে স্বাধীন ভারতের জনগণের ইচ্ছা অনুসারে এবং তাহাদের বিশ্বাসভাজন একটি স্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করা। সেই স্থায়ী জাতীয় সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই অস্থায়ী সরকার জাতীয় জনগণের বিশ্বাসভাজন হইয়া দেশ শাসন করিবে।"

সম্পূর্ণ ঘোষণাটি ছিল অন্যরকম। এই ঘোষণার পূর্ণ এবং প্রামাণিক পাঠ ভুলাভাই দেশাইয়ের বই থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই ঘোষণাটি নেতাজী বেতারযোগে পাঠ করেছিলেন। আয়ার লিখেছেন যে, আজাদ হিন্দ্‌ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঠিক আগের দিন মধ্যরাত্রে নেতাজী স্বয়ং ইহা রচনা করেন। আয়ার লিখেছেন: "তখন মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হয়েছে। আমি একটি আশ্চর্য জিনিস প্রত্যক্ষ করলাম। নেতাজীর প্রতিভার একটি নতুন পরিচয় পেলাম। বাঁ হাতে তিনি কতকগুলি শাদা কাগজ তুলে নিলেন, আর ডান হাতে নিলেন একটা পেন্সিল। লিখতে লাগলেন: "After their first defeat at the hands of the British in 1757 in Bengal....' কাগজ থেকে মুখ না তুলে তিনি লিখে চলেছেন অবিশ্রান্তভাবে। প্রথম পৃষ্ঠা লেখা শেষ হলে সেটি আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি সেটি নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে টাইপ করতে লাগলাম। সেখানে আরো দুজন ছিলেন—আবিদ ও স্বামী; তাঁরা পালা করে নেতাজীর ঘরে গিয়ে ঘোষণার পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আমার কাছে আনতে লাগলেন। আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল যে, পরের পৃষ্ঠা লিখবার জন্য আগের পৃষ্ঠায় কি লেখা হয়েছে তা দেখবার দরকার তাঁর হয়নি। আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সমগ্র পাণ্ডুলিপির মধ্যে কোথাও এতটুকু কাটাকুটি ছিল না, এমন কি কমা, সেমিকোলন পর্যন্ত নির্ভুলভাবে বসানো হয়েছিল। কাগজ থেকে চোখ তোলেন নি একবারও, আবিষ্টের মতোন সমানে লিখেছেন আর পান করেছেন পেয়ালার পর পেয়ালা

কৃষ্ণবর্ণ কফি। প্রত্যূষ হওয়ার পূর্বেই তিনি শেষ করেছেন এই ঘোষণা রচনার কাজ। তখন তাঁর টেবিলে দেখা গেল কফির পনরটি শূন্য পেয়ালা।

তাঁর প্রতিভার এই নিদর্শন সম্পর্কে আয়ার মন্তব্য করেছেন: "That he wrote out the whole proclamation sheet after sheet, without a break and at one sitting was some measure of Netaji's clear thinking, remarkable memory and grasp and facile pen. ....It was a memorable document." সত্যই এই ঘোষণা একটি স্মরণীয় দলিল এবং আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ইহা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মতোন।

॥ ২১শে অক্টোবরের ঘোষণা ॥

"১৭৫৭ সালে বাঙলাদেশে ব্রিটিশের হাতে আমাদের হোল প্রথম পরাজয়। সেই পরাজয়ের পর ভারতের জনগণ একশ বছর ধরে অবিশ্রান্তভাবে একটার পর একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছে। এই সময়ের ইতিহাস অতুলনীয় বীরত্ব ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সিরাজদ্দৌলা, মোহনলাল, হায়দার আলি, টিপু সুলতান, দক্ষিণ ভারতের ভেলু তাম্পি, আপ্পাসাহেব ভোঁসলা, মহারাষ্ট্রের পেশোয়া বাজীরাও, অযোধ্যার বেগম, পাঞ্জাবের সর্দার শ্যামসিং আতরিওয়ানা, ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপী, বিহারের মহারাজা কুনোয়ার সিং, নানাসাহেব এবং আরো বীর সন্তানদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের পিতৃপুরুষগণ প্রথমে বুঝতে পারেননি যে ব্রিটিশ সমগ্র ভারত গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। সেইজন্য তাঁরা সংহত ভাবে সম্মিলিত শক্তি নিয়ে এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেননি। বিদেশী

শাসনের অধীনে কিছুকাল থাকার পর ভারতের জনসাধারণ যখন অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারল তখনি তারা ঐক্যবদ্ধ হোল। ১৮৫৭ সাল। দিল্লীর শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের অধিনায়কত্বে স্বাধীন জাতি হিসাবে তারা শেষবারের মতোন যুদ্ধ করল। যুদ্ধের গোড়ার দিকে জয়লাভও হোল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এবং ভ্রান্ত নেতৃত্ব ধীরে ধীরে নিয়ে এলো চরম পরাজয় আর পরাধীনতা। তথাপি ঝান্সীর রাণী, তাঁতিয়া তোপী, কুনোয়ায় সিং এবং নানাসাহেব জাতির স্মৃতিপটে চিরদিনের মতোন রয়ে গেছেন নক্ষত্রের অম্লান দ্যুতি নিয়ে। ইতিহাসের নেপথ্য থেকে তাঁরাই আজ আমাদের প্রেরণা দিচ্ছেন আরো আত্মত্যাগ ও সাহসের সঙ্গে কাজ করতে।

"১৮৫৭ সালের ভাগ্যবিপর্যয়ের পর ইংরেজ জোর করে আমাদের নিরস্ত্র করল—শুরু হোল আতঙ্ক ও পাশবিকতার রাজত্ব। এই অবস্থায় ভারতবাসী কিছুদিনের মতোন হতমান ও হতবাক্ হয়ে রইল। তারপর ১৮৮৫ সালে হোল জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেস) জন্ম। ভারতে দেখা দিল নব জাতীয়তার এক নূতন জাগরণ। সেই জাগরণের ভিতর দিয়ে এলো একটার পর একটা আন্দোলন। হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণ যোগ দিল সেইসব আন্দোলনে—প্রচারকার্য, বিলিতি জিনিস বর্জন, সন্ত্রাসবাদ, ধ্বংসাত্মক আন্দোলন—কিছুই বাকী ছিল না। এমন কি সশস্ত্র বিপ্লবের পথে পর্যন্ত তারা অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু ১৮৮৫ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এইসব প্রচেষ্টা শেষ অবধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোল। ব্যর্থতার গ্লানিতে আছন্ন হয়ে স্বাধীনতালাভের জন্য ভারত যখন নূতন পথের সন্ধান করছিল, এমন সময় ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটল। সংগ্রামের জন্য তাঁর হাতে এক নূতন অস্ত্র—অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলন। সেই অস্ত্র হাতে নিয়ে ভারতের জনসাধারণ আবার শুরু করল তাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ।

"তারপর বিশবছর ধরে ভারতবাসী নানারকমের দেশপ্রেম-মূলক কাজ করে। মুক্তির বাণী পৌঁছল ভারতের ঘরে ঘরে। স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসী নির্যাতন বরণ করতে শিখল—শিখল আত্মত্যাগ করতে আর হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে। এমনি করে শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে সুদূর পল্লীগ্রামের জনগণ জেগে উঠল—একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের লোক তারা সকলেই, এই নূতন চেতনায় তারা হোল উদ্বুদ্ধ। এইভাবে জাতির জীবনে শুধু রাজনৈতিক চেতনাই ফিরে এলো না—সমস্ত জনসাধারণ আবার একটি অখণ্ড রাজনৈতিক পরিবারে পরিণত হোল। চল্লিশ কোটি নরনারী এখন কথা বলল এক সুরে এবং এক সাধারণ লক্ষ্যের জন্য একমন একপ্রাণ হয়ে তারা যুদ্ধ করতে শিখল। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলের কাজের দ্বারা ভারতের জনগণ অভ্রান্ত প্রমাণ দিল যে, তারা প্রস্তুত, তাদের নিজেদের শাসন ব্যবস্থা নিজেরাই করবার ক্ষমতা তারা অর্জন করেছে।

"এইভাবে তৈরি হোল ভারতের মুক্তির শেষ সংগ্রামের ভূমি। এমন সময় এই মহাযুদ্ধে জার্মানি তার মিত্রদের সাহায্যে য়ুরোপে আমাদের শত্রুদের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। এদিকে জাপান তার মিত্রদের সাহায্যে পূর্ব-এশিয়ায় আমাদের শত্রুকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তুলেছে। চারদিকের এই অনুকূল অবস্থায় ভারতের জনসাধারণ স্বাধীনতা লাভের একটা অভূতপূর্ব সুযোগ পেয়েছে। তারা এই সুযোগের ষোল আনা সদ্ব্যবহারই করতে চায়।

"বিদেশে ভারতীয়গণ রাজনৈতিক চেতনা লাভ করেছে এবং এক মন একতা নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে এ এক নতুন ঘটনা। তারা শুধু স্বদেশে তাদের দেশবাসীর সঙ্গে সমানভাবে চিন্তা করছে না, স্বাধীনতার পথ

ধরে তারা তাদের সঙ্গে পাশাপাশি চলেছে। পূর্ব-এশিয়ায় আজ বিশ লক্ষ ভারতীয় একটা সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে সংগঠিত হয়েছে। তাদের মুখে আজ শুধু একটি মাত্র কথা 'পূর্ণ সমর আয়োজন'। তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতের আজাদী ফৌজ—'দিল্লী চলো'—এই কথা তাদের মুখে।

"ভারতীয়দের সঙ্গে ক্রমাগত বঞ্চনা করে এসেছে ইংরেজ। সেই বঞ্চিতদের বুকের বেদনা জমে উঠেছে এই দীর্ঘকাল ধরে। ইংরেজের অবাধ লুণ্ঠন নিয়ে এসেছে মৃত্যু আর অনাহার। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তলায় আজ তাই ফাটল দেখা দিয়েছে। সমস্ত ভারতীয়দের শুভ ইচ্ছা থেকে আজ তারা বঞ্চিত। এক অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ইংরেজকে থাকতে হয়েছে। সেই সকল অশুভ ও অকল্যাণকর শাসনের শেষ চিহ্নটির মূলোৎপাটন করবার জন্য দরকার শুধু একটিমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সেই স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করবার দায়িত্ব এই আজাদী ফৌজের। স্বদেশে ভারতীয় জনগণের ও ব্রিটিশ সরকার গঠিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বহু লোকের সমর্থনে এবং বিদেশে আমাদের আত্মশক্তির উপর নির্ভর করেই ভারতীয় আজাদী ফৌজ সাফল্যের সঙ্গেই এই ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।"

সেদিন আজাদ হিন্দ্ সরকারের এই ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল জাতির ইতিহাসে তাঁদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সেই ঘোষণাপত্রে এঁদের স্বাক্ষর ছিল: ১। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, রাষ্ট্রাধিনায়ক, প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র ও যুদ্ধমন্ত্রী; ২। ক্যাপ্টেন মিস লক্ষ্মী স্বামীনাথন, নারী সংগঠন; ৩। এস. এ. আয়ার, প্রচারসচিব; ৪। লেঃ কঃ এ. সি. চ্যাটার্জি, অর্থ; ৫। লেঃ কঃ আজিদ আমেদ; ৬। লেঃ কঃ জে. কে. ভোঁসলে; ৭। লেঃ কঃ এন. এস. ভকৎ; ৮। লেঃ কঃ

গুলজারা সিং ; ৯। লেঃ কঃ এস. জেড. কিয়ানি ; ১০। লেঃ কঃ এ. পি. লোকনাথন ; ১১। লেঃ কঃ ঈশান কাদির ; ১২। লেঃ কঃ শাহ্‌ নওয়াজ, সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি ; ১৩। শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন সহায়, সম্পাদক ; ১৪। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু, সর্বোচ্চ পরামর্শ-দাতা ; ১৫। করিম গণি ; ১৬। শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাস ; ১৭। ডি. এম. খান ; ১৮। ই. ইয়েলাপ্পা ; ১৯। জে. বিবি ; ২০। সর্দার ঈশ্বর সিং (এই ছয়জন ছিলেন পরামর্শদাতা) এবং ২১। শ্রীযুক্ত এ. এন. সরকার, আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা। সিঙ্গাপুর ছিল আজাদ হিন্দ্‌ সরকারের সদর দপ্তর।

এইভাবে এতদিন পরে সুভাষচন্দ্রের অজ্ঞাতবাস সার্থক হোল। যে সংগঠনী প্রতিভা স্বরাজ্যদল গঠনে, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী সংগঠনে এবং ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনে প্রকাশ পেয়েছিল, আজ সেই প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখা গেল আজাদ হিন্দ্‌ সরকার সংগঠনে। যে অনন্যলব্ধ নেতৃত্বের সূচনা দেখা গিয়েছিল ভারতবর্ষে, আজ ভারতের বাইরে, সেই নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্র সার্থক করলেন স্বাধীন ভারত গভর্নমেণ্টের রাষ্ট্রাধিনায়করূপে। ত্যাগ-বিশুদ্ধ জীবন তিনি প্রথম উৎসর্গ করেছিলেন দেশমাতৃকার চরণে ১৯২১ সালে, সেই জীবনের চরিতার্থতা তিনি খুঁজে পেলেন একুশ বছর বাদে। মাতৃভূমির স্বাধীনতার যে সংকল্প বুকে নিয়ে তিনি একদিন স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন, যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে তিনি দেশ-দেশান্তর অশান্ত চিত্তে পরিভ্রমণ করেছেন এতদিন—তুচ্ছ করেছেন জীবন-মৃত্যু—আজ পূর্ব এশিয়ায় তরুণের সেই স্বপ্ন, সেই সংকল্প সার্থক হোল স্বাধীন ও সার্বভৌম গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করে।

২৩শে অক্টোবর। মধ্য রাত্রি।

আজাদ হিন্দ্‌ সরকার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল।

কথিত আছে, আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় নেতাজীর মন্ত্রিসভা সম্পূর্ণ একমত ছিলেন না। কিন্তু প্রতিবাদ করার ক্ষমতা কারো ছিল না; তাঁর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য সম্পর্কে তখন এবং পরে কোনো প্রশ্নই ছিল না। মন্ত্রিসভার কাজ ছিল তাঁকে শুধু পরামর্শ দেওয়া। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পৃথিবীর যে কয়টি রাষ্ট্র আজাদ হিন্দ্ সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল তাদের মধ্যে জাপান, ব্রহ্মদেশ, ক্রোশিয়া, জার্মানি, ফিলিপাইন, নানকিং মাঞ্চুকুয়ো, ইতালী ও শ্যামদেশের নাম উল্লেখযোগ্য। ফরাসীর ভিসি গভর্নমেণ্ট কোনো স্বীকৃতি দেন নি বলে নেতাজী কিছু পরিমাণে ক্ষুন্ন হয়েছিলেন।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ( I. N. A. No. 2; No. 1 ছিল জার্মানিতে গঠিত I. N. A.) ও আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠিত হওয়ার পর নেতাজী ঘোষণা করলেন: "১৮৫৭ সালের পর এই প্রথম আমরা নিজেদের গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিলাম। বিশ্বের বহু শক্তিশালী রাষ্ট্র এই গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ভারতে বিপ্লবের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিষ্ঠুর শোষণকে ধন্যবাদ, অবশেষে ক্ষুধার তাড়না, মন্বন্তর ও অনাহার * আজ ভারতবর্ষকে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। অতএব ভারতের শেষ মুক্তি সংগ্রাবের জন্য আজ ক্ষেত্র প্রস্তুত।"

একটি স্বাধীন রাষ্ট্র চালাতে গেলে প্রচুর অর্থের দরকার। বিশেষত সেই রাষ্ট্র যদি বিদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যুদ্ধরত থাকে। জাপান গভর্নমেণ্ট নেতাজীকে যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছিল তা তিনি ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক সাহায্য হিসাবে নয়। "Japanese money must not imply Japanese dictation".—তাঁর অনুগামীদের মনের মধ্যে

* এখানে নেতাজী বাঙলা ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন।

এই ভাব যে কত প্রবল ছিল তা নেতাজী ভাল করেই জানতেন। সৈন্যবাহিনীর খরচ আছে, সমর উপকরণ ঠিকভাবে রাখার খরচ আছে, নূতন নূতন সৈন্য রিক্রুট করার খরচ আছে—একমাত্র আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ব্যয়ের পরিমাণ কি সামান্য? এ ছাড়া, বেসামরিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে লীগেরও খরচ কম ছিল না। সুতরাং এই আর্থিক সমস্যার কথাটা সেদিন নেতাজীকে বিশেষভাবেই চিন্তা করতে হয়েছিল। সত্য বটে উদ্যম ও উৎসাহের প্রথম পর্বে পূর্ব-এশিয়াবাসী ভারতীয়দের, বিশেষ করে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর দানের পরিমাণ নিতান্ত কম ছিল না, কিন্তু কিছুকাল বাদে দেখা গেল যে সেই উৎসাহে ভাঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সাহায্যের পরিমাণও হ্রাস পেতে আরম্ভ করল। নেতাজী আজাদ হিন্দ্ সরকারের আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ় করার বিষয়টি বিশেষভাবে তখন চিন্তা করতে থাকেন। অবশ্য এ কথা সত্য যে তাঁর নামের একটা ঐন্দ্রজালিক শক্তি ছিল এবং সেই শক্তির বলে প্রথম প্রথম অপরিমিত টাকাও পাওয়া গিয়েছিল; এক ব্রহ্মদেশ থেকেই চার কোটি টাকা উঠেছিল। একবার নেতাজীকে অভিনন্দনের একটি ফুলের মালা প্রকাশ্য সভায় নীলামে বারো লক্ষ টাকায় বিক্রী হয়েছিল। তথাপি অর্থের জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল, কারণ রাষ্ট্রের বেসামরিক বিভাগের ব্যয় অপেক্ষা এর বাহিনী—যে বাহিনার সাধারণ সৈন্য সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার, আর অফিসারের সংখ্যা ছিল দেড় হাজার—খরচ ছিল অনেক।

২৫শে অক্টোবর মালয়ের ব্যবসায়ীদের এক সভায় বেশ একটু কঠিনভাবেই তাঁকে বলতে হয়েছিলঃ "আপনারা এই কথা মনে রাখবেন যে, একটি দেশ যখন যুদ্ধরত হয়, তখন আইনত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু থাকতে পারে না।…যদি আপনারা মনে করে থাকেন যে আপনাদের ধন-সম্পত্তি আপনাদেয় নিজেদের, তা হলে সে ধারণা খুবই ভ্রান্ত।…আপনাদের ধন ও প্রাণ এখন আপনাদের নয়। উহার মালিক এখন ভারতবর্ষ ছাড়া আর কেউ নয়।"

নেতাজী বলেছিলেন যে, মালয়ের কতকগুলি ধনী ব্যবসায়ী অনুযোগ করেছেন—নেতাজী টাকার জন্য জুলুম করছেন। তিনি এ কথাও শুনেছিলেন যে, তাঁরা নাকি তাঁদের nationality বদলাবার সুযোগ খুঁজছেন এবং অর্থসাহায্য প্রদান না করার অন্য উপায়ের কথা চিন্তা করছেন। তাঁদের এই মনোভাবের নিন্দা করে সেদিন তিনি বলেছিলেন :

"I have to liberate India and I shall make India independent by all means and at any cost....If you want to evade the issue, say plainly that you do not want independence ; then as I have already told you, a different path lies ahead of you.... Everyone who refuses to help our cause is our enemy."

পরবর্তী ইতিহাস সুপরিচিত। লেঃ কর্ণেল চ্যাটার্জির উপর তিনি অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবনের জন্য বললেন এবং এরই ফলে তখন গঠিত হয় 'The Board of Management for raising funds'. এবং ১৯৪৪ সালের শুরু থেকেই এই বোর্ডের কাছে ভারতীয়দের ধন-সম্পত্তির ঘোষণা দিতে হোত। এইভাবে আর্থিক সমস্যার কিছুটা সমাধান করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন।

আজাদ হিন্দ্ সরকারের ছিল নিজস্ব ডাকটিকিট, কারেন্সী নোট ও মুদ্রা। এই তিনটি জিনিস ব্যতীত কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের অর্থ হয় না বা ইহার কোনো মর্যাদা থাকে না। নেতাজী ইহা জানতেন এবং সেজন্য তিনি আজাদ হিন্দ্ সরকারের নিজস্ব ডাকটিকিট, কারেন্সী নোট ও মুদ্রার ব্যবস্থা করেছিলেন। এর নিজস্ব ভাষা ছিল হিন্দুস্থানী, 'জয় হিন্দ' ছিল পারস্পরিক অভ্যর্থনার ধ্বনি ; কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা ছিল এর নিজস্ব পতাকা আর রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ-মন' গানটির হিন্দুস্থানী সংস্করণ ছিল এর জাতীয় সংগীত।

দেখা যাচ্ছে, একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভাষা, পতাকা ও জাতীয় সংগীত —নেতাজী এই বিষয়ে সমস্ত ব্যবস্থাই করেছিলেন। নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে এ ছিল তাঁর প্রতিভার পরিচায়ক। পরবর্তী-কালে (১৯৪৪, জানুয়ারি) জাপ-সরকার ব্রিটিশ অধিকারমুক্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দুইটি আজাদ হিন্দ্ সরকারকে প্রদান করেছিলেন এবং সেই সময় জাপান নৌবিভাগের সাহায্যে তিনি একবার এই নূতন এলাকা পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। পোর্টব্লেয়ারের মেয়র তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। তখনই তিনি আন্দামানের নাম পরিবর্তন করে 'শহীদ' এবং নিকোবরের নাম পরিবর্তন করে 'স্বরাজ'—এই নূতন নামকরণ করেন এবং এই এলাকা দুইটি শাসনের জন্য তিনি লেঃ কর্নেল লোকনাথনকে চীফ কমিশনাররূপে নিয়োগ করেছিলেন।

আজাদ হিন্দ্ সরকার গঠিত হওয়ার পর এর রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে নেতাজীকে সবপ্রথম আমন্ত্রণ জানালেন তোজো টোকিও পরিদর্শনে আসার জন্য। সেখানে তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। ১৮ই নভেম্বর, ১৯৪৩, টোকিও ত্যাগ করে তিনি নানকিন, সাংহাই, ম্যানিলা ও সায়গন পরিদর্শন শেষ করে সিঙ্গাপুরে আসেন। সাংহাই থেকে তিনি চিয়াং কাইসেকের উদ্দেশে একটি বেতারভাষণ প্রদান করেন এবং তাতে তিনি জাপানের সঙ্গে শান্তিস্থাপনের জন্য চিয়াং কাইসেককে অনুরোধ করেন। নানকিনে এসে তিনি চিয়াং-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে শান্তিস্থাপনের কথা আর একবার আলোচনা করেন। সায়গন-প্রবাসী ভারতীয়েরা তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করেছিল। তাঁর এই পরিদর্শন প্রসঙ্গে তাঁর ইংরেজ জীবনচরিতকার মন্তব্য করেছেন: "The journey wae something of a triumphal progress." এইভাবেই সেদিন রাষ্ট্রপ্রধানরূপে নেতাজী আজাদ হিন্দ্ সরকারের মহিমা ও মর্যাদাকে জগতের সামনে তুলে ধরেছিলেন।

## ১১

এইবার আমরা দেখব Supreme Commander বা সর্বাধিনায়করূপে নেতাজী আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে কিভাবে একটি সুসংহত, সুসজ্জিত শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত করেছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর সামরিক প্রতিভা কি আশ্চর্য রকমে সার্থক হয়েছিল, শুধু তার পরিচয় লিপিবদ্ধ করতে হলে কয়েকখণ্ড পুস্তক লিখতে হয়। আয়ার লিখেছেন: "In these brief twenty-four months Netaji showed to the world that a single Indian could lead an Army and shake the British Empire in India to its foundation." সত্যিই সেদিন পূর্ব-এশিয়ায় গঠিত এবং নেতাজী-পরিচালিত এই আজাদ বাহিনীর আঘাতেই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল কেঁপে উঠেছিল।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রধান সেনাপতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রধানত দুর্ধর্ষ মিত্রশক্তি ইম্পিরিয়াল জাপানী সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় তাঁর সৈন্যদলকে সুশিক্ষিত করে তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং এই বিষয়ে জেনারেল তোজো ও জাপ-সৈন্যদলের প্রধান কর্মকর্তা জেনারেল ফুজিইয়ামা তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন বলে জানা যায়। তবে জাপানীদের সঙ্গে আজাদ বাহিনীর কিছুমাত্র সংস্রব ছিল না। নেতাজী টোকিওতে তোজোকে স্পষ্টভাবেই বলে দিয়েছিলেন যে, এই আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, ভারতবর্ষের প্রতিনিধিমূলক জাতীয় বাহিনী এবং এর নীতি কার্যকলাপ ও নেতৃত্ব সবই আজাদ হিন্দ্ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নির্ধারিত ও পরিচালিত হবে।

তাঁর নেতৃত্বে পূর্ব-এশিয়ায় আজাদ হিন্দ্ বাহিনী যেদিন নূতন করে গঠিত হয় সেদিন (৫ই জুলাই, ১৯৪৩) সমবেত সৈন্যদের

সামনে দাঁড়িয়ে নেতাজী যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন তা এখানে অংশত উদ্ধৃত হোল :

"ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সেনাদল! আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গর্ব করবার দিন। আজ ভগবান আমাকে সমগ্র জগতের কাছে এই ঘোষণা করবার অপূর্ব সুযোগ ও সম্মান দিয়েছেন যে, ভারতকে স্বাধীন করবার জন্য একটি সেনাদল গঠিত হয়েছে। এই বাহিনী যে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্ত করবে তা নয়,—এই সেনাদলকেই ভিত্তি করে স্বাধীন ভারতের জাতীয় বাহিনী ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে। প্রত্যেক ভারতবাসী এজন্য গর্ববোধ করবে।

"সৈনিকগণ! 'দিল্লী চলো'—এই তোমাদের রণধ্বনি হোক। আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের পর কতজন জীবিত থাকব, আমি জানি না; কিন্তু এ আমি নিশ্চিতভাবেই জানি যে, চরম জয়লাভ আমরাই করব এবং যতদিন পর্যন্ত যেসব বীর বেঁচে থাকবে, তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অপর একটি শ্মশানভূমি—প্রাচীন দিল্লীর লাল কেল্লায় তাদের বিজয়োৎসব সম্পন্ন না করবে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না।

"দেশসেবার কর্মক্ষেত্রে নেমে অবধি আমার মনে হয়েছে যে, স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদের আর সবই আছে, নেই শুধু স্বাধীনতা প্রয়াসী সেনাদল। ভারতের জাতীয় বাহিনী গঠনে অগ্রগামী হওয়ার সুযোগ ও সম্মানলাভে তোমরা সেই ভাগ্যবান। তোমরা ভারতের স্বাধীনতা লাভের শেষ বাধাকে দূর করেছ। এই মহৎ ব্রতের তোমরাই অগ্রদূত।...অস্ত্রবলের সাহায্যে এবং তোমাদের শোণিত উৎসর্গ দ্বারা তোমাদিগকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। তারপর ভারতের স্বাধীনতা সর্বদা রক্ষা করাই হবে তোমাদের কর্তব্য। দেশরক্ষার শক্তিকে এমন অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, আমরা যেন আর কোনোদিন আমাদের স্বাধীনতা না হারাই।

"বিশ্বস্ততা, ত্যাগ ও কর্তব্যপালন—এই হবে আজাদী সৈনিকের আদর্শ।...বর্তমানে তোমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখকষ্ট, দুর্গম অভিযান এবং মৃত্যু ভিন্ন আমার দেওয়ার কিছু নেই। কিন্তু তোমরা যদি জীবনে ও মরণে আমার অনুসরণ করো, আমি তোমাদের বিজয় ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে নিয়ে যাব।"

একটি বিরাট বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষরূপে নেতাজীকে—পূর্ণ সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত নেতাজীকে কি রকম মানিয়েছিল, সেই কথা লিখতে গিয়ে আয়ার বলেছেন: "The title of Supreme Commander, if it truly fitted any commander on the battlefields of Europe or Asia, fitted Netaji most superbly. He looked supreme, every inch of him." ইহা অত্যুক্তি নয়, অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

২৫শে আগস্ট, ১৯৪৩।

নেতাজী আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করলেন।

এই উপলক্ষে স্বাক্ষরিত এক বিশেষ নির্দেশনামায় তিনি বলেছিলেন: "আজাদ হিন্দ্ ফৌজ যাতে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়, সেজন্য আমি আজ থেকে আমাদের এই সেনাবাহিনীর সরাসরি কর্তৃত্ব গ্রহণ করলাম। ভারতের মুক্তি ফৌজের অধিনায়কত্ব অপেক্ষা বড় সম্মান আর কিছুতেই হতে পারে না।...আমি জাতিধর্মনির্বিশেষে ৪০ কোটি ভারতবাসীর সেবক বলে নিজেকে মনে করি। ভারতের স্বাধীনতার জন্য মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।"

হাজার কণ্ঠে অমনি ধ্বনি উঠল—ইনক্লাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ্ জিন্দাবাদ! সিঙ্গাপুরের প্রখর সূর্যের আলোয় আজাদী সৈনিকের বেয়নেটগুলো ঝক্ ঝক্ করে উঠল। দেশপ্রেমিক প্রবাসী

ভারতীয়গণ নেতাজীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই বাহিনীকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নিলেন ও একে আরো শক্তিশালী করে তোলার জন্য অর্থদানে কোনো কার্পণ্যই করলেন না তাঁরা। আরো অনেক নূতন লোক সৈন্যদলে নাম লিখাতে এলো। সৈন্যদের সুশিক্ষার জন্য নেতাজীর নির্দেশে মালয়ে চারটি সামরিক বিদ্যালয় ও একটি বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হোল। এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে একই সময়ে সাত হাজার সৈন্যকে পালাক্রমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। পরে রেঙ্গুনেও একটি সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছিল।

শিবিরে শিবিরে সৈনিকরা শিক্ষা পেতে লাগল। নেতাজী নিজে প্রত্যেক শিবির পরিদর্শন করতেন, সৈন্যদের উৎসাহ দিতেন। যেসব স্বেচ্ছাসেবিকা এগিয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁকে সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ্ সরকার ও আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি বীরাঙ্গনা লক্ষ্মী। তিনি ওদেশে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। তাঁরই আগ্রহ এবং প্রস্তাবানুসারে 'রাণী অব্ ঝান্সী রেজিমেণ্ট'-এর সৃষ্টি হয়েছিল। লক্ষ্মী ছিলেন এর অধিনায়িকা। এই বাহিনী নেতাজীর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। এই বাহিনীর সংখ্যা ছিল এক হাজারের উপর। গোড়ার দিকে এঁদের কাজ সামরিক হাসপাতালে সেবা-শুশ্রূষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এই নারীবাহিনীর রক্তে যে দ্রুত তাল লেগেছিল সেদিন, তা যেন তাঁদের রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত করে তুলল—শুশ্রূষার শান্ত কাজে সন্তুষ্ট রাখতে পারল না; তাঁরা যুদ্ধে যেতে চাইলেন। নেতাজী সে আবেদন গ্রাহ্য করলেন। কথিত আছে, সেই আবেদনে মেয়েরা স্বাক্ষর করেছিলেন নিজেদের আঙুল কেটে রক্ত দিয়ে। ফুলপ্যাণ্ট, খাকী শার্ট, ফেটিক ক্যাপ ও রবারের বুট পরে এই বীরাঙ্গনারা সত্যিই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে গিয়েছিলেন। নেতাজী নিজের হাতে এই বাহিনীর প্রত্যেক মেয়েকে একটি করে রিভলভার, একটি রাইফেল ও একটি বেয়নেট প্রদান

করেছিলেন। ঝাঁসীরাণী বাহিনীতে পূর্ব-এশিয়াবাসী বহু প্রদেশের ভারতীয় নারী স্বেচ্ছায় যোগদান করেছিলেন। এই বাহিনী গঠন করে তিনি যে নৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন, দুঃখের বিষয়, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আমরা আজো উপলব্ধি করতে পারিনি। এত অল্পসময়ের মধ্যে অমন ব্যাপক সংগঠনের ক্ষমতা একমাত্র নেতাজীরই থাকা সম্ভব। এ তাঁর নেতৃত্ব-প্রতিভার পরিচায়ক।

ফৌজের মধ্যে ছিল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের লোক। তাদের সকলকেই নেতাজী এমন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন যে, একমাত্র স্বাধীনতা ভিন্ন তাদের মনে আর কোনো চিন্তা স্থান পায়নি। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার লেশমাত্র ছিল না কারো মনে। প্রত্যেক সৈনিককে একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হোত। সেটি এই: "আমি স্বেচ্ছায় ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিচ্ছি। আমি দৃঢ় চিত্তে এবং সর্বান্তঃকরণে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করছি।...জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীকেই আমি নিজের ভাই আর বোন বলে গ্রহণ করব।" মোট কথা, সেদিন ভারতের স্বাধীনতার জন্য নেতাজী যে বিরাট আদর্শ আজাদী সৈন্যদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, তাই সেদিন তাদের রক্তের মধ্যে এনে দিয়েছিল উষ্ণতা আর হৃদয়ে আলোড়ন।

১৯৪৪। জানুয়ারি।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অগ্রগামী প্রধান শিবির ও আজাদ হিন্দ্ সরকারের কেবিনেট (মন্ত্রিসভা) রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করা হোল। অবশেষে ভারত ও-ব্রহ্মদেশের সীমান্ত অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে ভারতের মুক্তিসেনার বহু প্রতীক্ষিত যুদ্ধ আরম্ভ হোল ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে। ঐ দিন ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ইম্ফল আক্রমণের

জন্য অগ্রসর হয়। ৩রা ফেব্রুয়ারি প্রথম ডিভিসন পদাতিক সৈন্যদের বিদায় জানিয়ে নেতাজী তাদের বললেন :

"দূরে—বহু দূরে ঐ নদী ছাড়াইয়া, ঐ জঙ্গলাকীর্ণ ভূখণ্ড ছাড়াইয়া, ঐ পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করিয়া আমাদের দেশ—ঐ দেশে আমরা জন্মলাভ করিয়াছি। ঐ দেশে আমরা আবার ফিরিয়া যাইতেছি। শোনো, ভারত আমাদিগকে ডাকিতেছে, ভারতের রাজধানী দিল্লী আমাদিগকে ডাকিতেছে—কোটি কোটি স্বদেশবাসী আমাদের ডাকিতেছে—আত্মীয়েরা আত্মীয়দের ডাকিতেছে। ওঠো, সময় নষ্ট করিও না, অস্ত্র হাতে লও। তোমাদের সম্মুখে ঐ পথ—ঐ পথ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন আমাদের অগ্রগামীরা। আমরা ঐ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইব। শত্রু সৈন্যের মধ্য দিয়া আমরা আমাদের পথ করিয়া লইব, অথবা ভগবানের ইচ্ছা হয়—আমরা শহীদের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিয়া লইব। যে পথ ধরিয়া আমাদের সেনাবাহিনী দিল্লীতে পৌঁছবে—শেষ শয্যা গ্রহণ করিবার সময় আমরা একবার সেই পথ চুম্বন করিয়া লইব। দিল্লীর পথ স্বাধীনতার পথ। চলো দিল্লী।"

এই উদ্দীপনাময়ী কথা শোনার পর মুক্তি-স্পৃহার বন্যাবেগে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে আজাদী সৈন্যদের হৃদয়ে। তুচ্ছ হয় জীবন-মৃত্যু। নির্ভীক চিত্তে উন্নত শিরে তারা তাদের জঙ্গী গীত গাইতে গাইতে অগ্রসর হয়ে চলল :

অব্ দিল্লী চলো, দিল্লী চলো, দিল্লী চলেংগে
রোকেন হম কিসীকে রুঁকেঁ হৈঁ ন রুকেংগে॥
ঝণ্ডা তিরংগা লাল কিলে পৈ উড়ায়েংগে
জয়হিন্দ্ কে নারোঁ সে ফলক কো হিলায়েংগে॥

বীর যোদ্ধারা রণক্ষেত্রে গেল। টিপু সুলতানের বাঘ এতদিন পরে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। আরাকানের দুর্গম পথ অতিক্রম করে তারা চলেছে মনের আনন্দে খুশির গান গাইতে গাইতে।

লেফট রাইট, লেফট রাইট—হাজার হাজার আজাদী সৈন্যের কণ্ঠ থেকে উঠছে ভীম রণ-হুঙ্কার—জয় হিন্দ্।

তারা এগিয়ে চলেছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর মৃত্যু—এই তাদের পাথেয়। নেতাজী তাদের বলেছেন—ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর মৃত্যু, এই এখন আমি তোমাদের দিতে পারি। ধূসর পর্বতমালা অতিক্রম করে, আরাকানের গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে হিন্দুস্থানের শের, আজাদী সৈন্যরা এই বলতে বলতে চলেছে ঃ "কদম কদম বাঢ়ায়ে যায়, খুশিসে গীত গায়ে যায়।"

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রেব আজন্ম স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে—প্রজ্বলন্ত দেশপ্রেমের বহ্নিতে উদ্দীপ্ত ভারতের মুক্তিকামী আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সৈন্যগণ পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে জন্মভূমি ভারতের সীমান্তভূমির দিকে।

ঐ দেখা যায় ভারতের পূর্ব সীমান্ত! টামু, কোহিমা, প্যালেল, টিড্ডিম। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে আজাদী ফৌজ পদার্পণ করল ১৮ই মার্চ। রেঙ্গুনে বসে নেতাজী এই সংবাদ পেলেন। ভারতের মাটি তারা চুম্বন করল—আব মাতৃভূমির উদ্দেশে তারা জানাল তাদের অভিবাদন। জাতীয় বাহিনীর তিনটি ব্রিগেড, ব্রহ্মজাতীয় বাহিনীর তিনটি ব্রিগেড ও কিছু জাপানী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে মোরাই, কোহিমা এবং অন্যান্য কয়েকটি গ্রাম দখল করার পর আজাদী ফৌজ ইম্ফল বেষ্টন করে ফেলল। আজাদ বাহিনীর সেনাপতি মেজর-জেনারেল শাহ্ নওয়াজ ভারতের ত্রিবর্ণ-লাঞ্ছিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। রেঙ্গুনে যখন এই সংবাদ পৌঁছল নেতাজী উল্লসিত হয়ে বললেন ঃ "ভারতের মৃত্তিকা আজ আমাদের রক্তে অভিষিক্ত—এখানকার বাতাস আমাদের মৃত্যুপথযাত্রী বীরগণের শেষ নিঃশ্বাসে আজ পবিত্র।"

জুন মাস।

আজাদী ফৌজ প্যালেল বিমানঘাঁটি আক্রমণ করল।

তাদের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়। রসদ প্রায় নিঃশেষিত। বন্যফল আর গাছের শিকড় খেয়ে তারা সমানে যুদ্ধ করেছে। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, অতি স্বল্পপরিমাণ চাল অবশিষ্ট আছে। দুই-একদিনের মধ্যে রসদ না এসে পৌঁছলে অনশন অনিবার্য। সেনাপতির কাছে এই কথা জানাতেই তিনি বললেন—তাদের সামনেই রয়েছে ইংরেজের ঐ বিমানঘাঁটি। প্রচুর রসদ ওর ভিতর আছে।

তারপর রাত্রির অন্ধকারে ক্ষুধার্ত হায়েনার মতোন আজাদী-সৈন্যদল 'জয় হিন্দ্' রবে আক্রমণ করল সেই বিমানঘাঁটি। ইংরেজ সৈন্যদল সে আক্রমণের প্রচণ্ডতা রুখতে পারল না এবং সেই অতর্কিত আক্রমণের জন্য তারা প্রস্তুতও ছিল না। প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করে শিবিরে ফিরে এলো বীর আজাদী সৈন্যদল।

জুলাই মাস, ১৯৪৪। ভারতের পূর্ব সীমান্তে আজাদী ফৌজ যুদ্ধ করছে। বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারা, রসদের অনটন, গোলা-গুলির অভাব—তবু এত অসুবিধার মধ্যেও সৈনিকদের উৎসাহ এতটুকু কমেনি, তাদের উদ্যম এতটুকু দমেনি। তাদের নেতাজী স্বয়ং সীমান্তে এসে সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ পরিদর্শন করে গিয়েছেন। প্রত্যেক সৈন্যকে এই বলে তিনি উৎসাহ দিয়ে গেছেন যে, দিল্লীর লাল কেল্লায় না পৌঁছান পর্যন্ত এ যুদ্ধের শেষ নেই।

তাই যুদ্ধ করতে করতে আজাদী ফৌজ যতই আসামের সমতল ভূমিতে নামতে থাকে, ততই তাদের উদ্দীপনা বেড়ে ওঠে। সামনে যারা মরলো, পেছনের লোকেরা সেই সব মৃত সৈনিকদের শির চুম্বন করে অগ্রসর হতে থাকে আর উল্লাসে গাইতে থাকে : "চলো দিল্লী পুকারকে, কৌমী নিশান সামালকে।"

আসামের আকাশে বর্ষার ঘন মেঘ। উপত্যকার পিচ্ছিল পথ, পথে গিরিসঙ্কট, খরস্রোতা পার্বত্য নদী বর্ষায় আরও উদ্দাম হয়ে উঠেছে। সম্মুখে চতুর্দশ বাহিনী আর অপরিমিত রণ-সম্ভার নিয়ে লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন। আজাদী ফৌজের সংগ্রামে তবু ক্লান্তি নেই। প্রাণ দেবে তবু তারা কোনো ক্ষেত্রেই পেছনে হটবে না—এই ছিল তাদের প্রতিজ্ঞা। রক্তের স্বাক্ষরে তারা তাদের সেই প্রতিজ্ঞা পালন করেছে। তাদের নেতাজী বলেছেন: "তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো।" বলেছেন: "স্বাধীনতার এই যুদ্ধে আজাদী বীরের রক্তেই আমাদের পূর্বপুরুষদের অর্জিত সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।" আসামের মাটি তাই সেদিন তাদের তাজা রক্তে লাল হয়ে উঠ্‌লো।

নানা অসুবিধার মধ্যে আজাদী ফৌজ যুদ্ধ করেছে পুরো ছ'মাস। এর মধ্যে ১৭টি বিভিন্ন যুদ্ধ ও কয়েকটি ছোটখাটো যুদ্ধ হয়েছে। ব্রিটিশ, আমেরিকান ও বেতনভুক্ত ভারতীয় সৈন্যগণ আজাদী বীরের আঘাতের পর আঘাতে টলে পড়েছে বার বার, পিছু হটেছে অনেক বার। এক এক রণক্ষেত্রে মিত্রশক্তিকে পর্যুদস্ত হতে হয়েছিল এদের হাতে। আজাদী সৈন্যেব মণিপুর অভিযান গোড়ার দিকে ছিল একটি সাফল্যমণ্ডিত অভিযান। নেতাজীর বিমানবহর কতবার কলিকাতা বাঙলা ও আসামের শহরগুলোর উপর দিয়ে উড়ে গিয়েছে বিনা বাধায়।

এমন সময় একটি ঘটনা ঘটলো। নেতাজী নিজে ফ্রণ্টে এসেছেন। ইম্‌ফলের চারিদিকে আজাদীদের লৌহবেষ্টনী পরেছে তখন। পশ্চাদপসরণ ছাড়া মিত্রশক্তির চতুর্দশ বাহিনীর আর কোনো উপায় নেই। যখন আজাদীদের চরম আক্রমণ আসন্ন, তখন কোনো এক বিশ্বাসহন্তা লেফটেনেণ্ট সিং বেরিয়ে এলো আজাদী লাইনের বাইরে। লাইনের সান্ত্রী তাকে রুখ্‌লো। কিন্তু সে এক মিথ্যা কাহিনীর অবতারণা করে সান্ত্রীকে দিল

ধাপ্পা। বললে, সে যাচ্ছে অগ্রবর্তী সন্ধানীদল যারা জঙ্গলে লুকিয়ে আছে তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে। এই বলে সৈন্য-সংস্থাপন সংক্রান্ত কাগজপত্র ম্যাপ ইত্যাদি খুলে দেখিয়ে সরল সান্ত্রীকে সে ভুলালো। কিন্তু বিশ্বাসহন্তা সিং আর ফিরল না। কয়েক ঘণ্টা পরে সকালের দিকে নেতাজী ব্যাপারটা জানতে পারলেন। তৎক্ষণাৎ আদেশ হোল গোলাবারুদ সৈন্য-সংস্থাপন আমূল বদলে ফেলতে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই গুপ্ত কাগজপত্র-গুলো সব শত্রুর হস্তগত হয়েছে। আরম্ভ হোল ঝড়ের মতো বোমা বর্ষণ মিত্রপক্ষ হতে। আজাদী সৈন্যদের হট্‌তে হয় বাধ্য হয়ে। এই তাদের প্রথম পশ্চাদপসরণ।

এই ঘটনার পর নেতাজী নির্দেশ দিয়েছিলেন: যে কোনো আজাদী সেনা—যে কোনো পদই তার হোক না কেন—যুদ্ধের লাইন পার হবার চেষ্টা করলেই তখুনি তাকে গুলী করে মারা হবে।

ঠিক সেই সময় নেতাজীর সঙ্গে জাপানী সেনাবিভাগের উচ্চতম কর্তাদের সঙ্গে আরম্ভ হলো দারুণ মন কষাকষি। তারা দেখলো যে আজাদীরা ঠিক জাপানীদের সুবিধা মত, তাদের মতলব মত কাজ করছে না। পথঘাট ও যাতায়াতের অসুবিধার সঙ্গে এসে তখন যোগ দিয়েছে প্রলয়ঙ্কর বর্ষা। আজাদীদের পেছনে হটবার রাস্তাও হলো বন্ধ। এমন অবস্থার মধ্যেও তাদের বীরত্ব কিন্তু সমান মাত্রায় অটুট ছিল। আর মনোবল ছিল অক্ষুণ্ণ।

যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রীদের বৈঠকে নেতাজী বললেন: আমাদের অভিযান আরম্ভ হয়েছে অনেক বিলম্বে। বর্ষা আমাদের বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। পথঘাট সব ভেসে গেছে। খরস্রোতা নদীতে পারাপারের উপায় নেই। একমাত্র উপায় ছিল বর্ষা নামবার আগে ইম্‌ফল দখল করা। দখল আমরা করতে পারতাম যদি আমাদের বিমান-

বাহিনী আরও শক্তিশালী হতো। বর্ষা নামবার আগে পর্যন্ত সমস্ত রণক্ষেত্রেই আমাদের জয়লাভ হয়েছিল। আরাকান, কালাদিন, টিড্ডিম, প্যালেল, কোহিমা, হাকা—সর্বত্রই আমাদের সৈন্যরা শত্রুদের পর্যুদস্ত করেছিল।

. চারিদিকেব অবস্থা ক্রমে সঙ্গীন হয়ে এলো। এই রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে আর যুদ্ধ চালানো অসম্ভব। আজাদী সৈন্যদের তখন পশ্চাদপসরণ ভিন্ন আর কোনো উপায় ছিল না। সেনাপতির হুকুম এলো—রিট্রিট, পেছনে ফেরো।

রিট্রিট! অসম্ভব। এত আশা, এত উদ্দীপনা, এত রক্তপাত—সবই কি তবে ব্যর্থ হবে? বীর সৈনিকরা তবু যুদ্ধ করতে চায়—জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করতে চায়। তাদের যে দিল্লী যেতে হবে—দিল্লীর লাল কেল্লায় উড়াতে হবে বিজয় পতাকা—তাদের নেতাজীর যে এই আদেশ ছিল তাদের উপর। তিনি যে বলেছেন কোনো অবস্থাতেই আমরা যেন পেছনে না হটি।

কম্যাণ্ডার ও অফিসাররা তখন কত করে বোঝায় সৈনিকদের—আর যে যুদ্ধ করা বৃথা। জয়লাভের কোনো আশাই নেই।

আশা নেই! এতদিন তবে জঙ্গলের ঘাস খেয়ে দিন কাটালাম কি জন্য? দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় আজাদী বীর। সংকল্পের কঠিন রেখা তাদের প্রত্যেকের মুখে। তারা পিছু হটবে না—তারা দিল্লী যাবেই। যেমন করে হোক আমরা শত্রুদের সঙ্গে লড়বো—তাদের উচ্ছেদ সাধন করবো।

অযথা জীবন নাশে লাভ নেই অথচ সৈনিকরা রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শনে অসম্মত। এমন অবস্থায় সেনাপতিরা তাঁদের নেতাজীর নির্দেশের জন্যে তাঁর কাছে এক বিশেষ দূতকে পাঠিয়ে দিলেন। দূত ফিরে এলো নেতাজীর স্বাক্ষরিত আদেশ নিয়ে। সে আদেশ ছিল পেছনে হটে আসার জন্য।

সৈনিকরা আর প্রতিবাদ করল না। সজল চক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আজাদী বীররা সে আদেশ মেনে নিলো। ইম্ফলের রণশিবিরে সে কী মর্মান্তিক দৃশ্য। সাহসী যোদ্ধারা বালকের মত কাঁদলো। ভগ্নহৃদয়ে পশ্চাদপসরণ করলো। সেদিন তারা কেউ জল পর্যন্ত স্পর্শ করেনি। মাতৃভূমির মাটি চুম্বন করে আবার তারা আরা-কানের অরণ্যপথে যাত্রা শুরু করলো রেঙ্গুনের দিকে।

রেঙ্গুনে ফিরে এসে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চল্‌লো কিছুদিন। কিন্তু আকাশে ও স্থলপথে শত্রুর আক্রমণ তখন এমন প্রচণ্ড, এমন তীব্র এবং এমন ব্যাপক হয়ে উঠলো যে অবশেষে ১৯শে মে তারিখে রেঙ্গুনের পতন হলো। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জাতীয় বাহিনীর যেসব সৈন্যরা সেখানে ছিল তারা সকলেই শত্রুর হাতে বন্দী হলো। রেঙ্গুন পরিত্যাগের দিন নেতাজী সৈনিকদের উদ্দেশে তাঁর শেষ নির্দেশনামায় এই কথা বলে গেলেন ঃ

"আজ গভীর বেদনার সহিত আমি সেই ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছি যেখানে আপনারা ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে বীরোচিত সংগ্রাম চালাইয়াছেন ও এখনও চালাইতেছেন। ইম্ফল ও ব্রহ্মদেশে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কিন্তু ইহা প্রথম চেষ্টামাত্র। আরও অনেক চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে। চিরদিন আমি আশাবাদী। কোনো অবস্থাতেই আমি পরাজয় মানিয়া লইতে রাজী নই। ইম্ফলের সমতল ভূখণ্ডে, আরাকানের জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে, ব্রহ্মদেশে ও অন্যান্য স্থানে শত্রুদের বিরুদ্ধে আপনাদের বীরত্বের কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য লিখিত থাকিবে।"

রেঙ্গুনের পতনের পর আজাদ হিন্দ্‌ গভর্নমেণ্টের সদর দপ্তর আবার সিঙ্গাপুরে স্থানান্তরিত হোল। এইখান থেকে অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ চালাবেন, নতুন করে সংগ্রামের আয়োজন করবেন

এই ছিল নেতাজীর আশা। রেঙ্গুন পরিত্যাগের পর তিনি নতুন উদ্যমে নতুন আশা নিয়ে কাজ করেন। সকলেরই আশা ছিল এ পরাজয় সাময়িক মাত্র। কিন্তু ১৯৪৫ সালের আগস্টের মাঝামাঝি জাপানের চূড়ান্ত পরাজয় সমস্ত আশা উদ্যমকে নির্মূল করে দিল। জলেস্থলে অন্তরীক্ষে মিত্রশক্তির বিপুল বাহিনীকে প্রতিরোধ করবার মত ক্ষমতা আজাদী ফৌজের তখন আর ছিল না। ক্রমাগত আত্মপক্ষ রক্ষা করতে করতে ফৌজের শক্তি ও অস্ত্রসম্ভার নিঃশেষ হয়ে এল। পরাজয়ের পর পরাজয়ে সৈন্যবাহিনীতে এল অবসাদ, এল বিশৃঙ্খলা। সর্বত্র একটা ছত্রভঙ্গভাব।

এমন সময় আসন্ন পরাজয় বুঝতে পেরে নেতাজী আদেশ দিলেন—আত্মসমর্পণ করতে। ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৫ সাল। সিঙ্গাপুরের আকাশে মিত্রশক্তির বিমানবহর। চারদিক দিয়ে শত্রুসৈন্য বিজয় উল্লাসে অগ্রসর হচ্ছে। সমগ্র বাহিনীর সৈনিক ও সেনাপতিদের উদ্দেশে নেতাজীর সর্বশেষ নির্দেশনামা এলো রেডিওর বক্তৃতা মারফত: "আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অফিসার ও বীর সৈনিকগণ! রেঙ্গুন পরিত্যাগের সময় যে আশা করেছিলাম তাও সফল হোল না। জাপানের চূড়ান্ত পরাজয়ের ফলেই আমাদের এই শোচনীয় বিপর্যয়। যুদ্ধজয়ের আর কোনো আশাই নেই। আপনাদের তাই আমি শান্তভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দিলাম। জয় ও পরাজয় যুদ্ধে দুই-ই আছে—এর জন্য দুঃখ পাবার কিছুই নেই জানবেন। বরং আমরা এই ভেবে আজ গর্ব ও গৌরব বোধ করবো যে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমরা যে ঐতিহাসিক প্রচেষ্টা করেছি, ভারতবাসী একদিন না একদিন সম্পূর্ণরূপে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেই। এই পরাজয়, এই আত্মসমর্পণেই এর শেষ নয়। স্বাধীনতালাভের এই সংকল্প, এই অমিত সাহস আবার একদিন আর এক নতুন ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করবে। জয় হিন্দ্।"

পরের দিন, ১৭ই আগস্ট, নেতাজী সিঙ্গাপুর ত্যাগ করেন। এইভাবে ভারতের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের ওপর যবনিকাপাত হলো। যবনিকাপাত হলো সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, "There can be little doubt that Subhas Bose's Indian National Army hastened the end of the British rule in India." নেতাজী চির আশাবাদী; ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর ছিল অখণ্ড বিশ্বাস। তাই দেখতে পাই, যাওয়ার দু'দিন আগে (১৫ই আগস্ট, ১৯৪৫) তিনি তাঁর সৈন্যদের আশ্বাস দিয়ে বললেন: "Never falter in your faith in India's destiny. There is no power on earth that can keep India enslaved, India shall be free and before long." এর ঠিক দু'বছর পরেই ভারতবর্ষ লাভ করে তার ঈপ্সিত স্বাধীনতা।

## ১২

৫ই নভেম্বর, ১৯৪৫ সাল।

সারা ভারতের জনমতের বিরুদ্ধে দিল্লীর লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের মামলার বিচার আরম্ভ হয় এই তারিখে। সে ঐতিহাসিক বিচার-কাহিনীর সম্পূর্ণ বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জাতীয় বাহিনীর বিচারাধীন অফিসারদের পক্ষ সমর্থনের জন্য সেদিন যে আয়োজন করা হয়েছিল তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। আসামীদের পক্ষ সমর্থন করে সেদিন প্রখ্যাত কংগ্রেসনেতা ও ব্যারিস্টার ভুলাভাই দেশাই যে অপূর্ব সওয়াল করেছিলেন তাও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। সেদিন তিনি বলেছিলেন ঃ

"নিজের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেক পরাধীন জাতিরই যুদ্ধ করিবার, বিদ্রোহ করিবার অধিকার আছে। রাজানুগত্য অস্বীকার করিয়া আজাদী ফৌজের সৈনিকগণ আইনতঃ কোনো অপরাধ করেন নাই। আইন অপেক্ষা ইতিহাসের বিধানকেই এখানে স্বীকার করিতে হইবে। আনুগত্যের প্রশ্ন এই মামলায় নিতান্তই গৌণ; স্বাধীনতার দাবীই প্রথম ও প্রধান কথা। আন্তর্জাতিক আইনের চক্ষে এই আজাদ হিন্দ্ গভর্নমেণ্ট ক্ষমতা-সম্পন্ন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া আজাদী ফৌজের সৈনিকগণ কোনো অপরাধ করেন নাই।"

ছত্রিশ বছর আগে এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছিল বাঙলাদেশে আর একটি ঐতিহাসিক মামলায়—আলিপুর বোমার মামলা। এই মামলায় প্রধান আসামী ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ আর তাঁর পক্ষ সমর্থন করেছিলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। অরবিন্দ ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ দিয়েছিলেন; স্বাধীনতা ছিল তাঁর জীবনের মন্ত্র। নেতাজীও ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ

দিয়েছিলেন; স্বাধীনতা তাঁরও জীবনের মন্ত্র ছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যগণ এবং সেনানায়কগণ সেই আদর্শে, সেই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য তাঁরা ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন—লালকেল্লায় বিচারে সেই সত্যটাই চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। বিচারে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ তথা আজাদ হিন্দ্ সরকারের সকল তথ্য যখন উদ্ঘাটিত হোল, তখন সংশয়াতীতভাবেই জানা গেল যে, নেতাজী ও তাঁর আজাদী সৈন্যদের একমাত্র কাম্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা, ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশশাসন থেকে মুক্ত করা।

এই বিচারের আলোয় আমরা সেদিন পেলাম নূতন দৃষ্টি—সেই দৃষ্টিতে প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে নেতাজী হয়ে উঠলেন গর্বের ও শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন এক নূতন রূপে—আর স্বাধীনতাকামী আজাদী সৈন্যরা হোল সম্মানের পাত্র। এই সম্মান স্বাধীনতার সম্মান। যুগে যুগে দেশে দেশে স্বাধীনতা অর্জনের দুস্তর তপস্যায় যাঁরা আত্মবলিদান দিয়ে বিস্মরণের অতীত হয়ে গিয়েছেন, বিশ্বের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁদের যে সম্মান, লাল কেল্লার বিচারে প্রমাণিত হোল যে, নেতাজী তথা আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সম্মান তারই অনুরূপ। সমগ্র জাতির স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন ইংরেজের অপপ্রচার সত্ত্বেও, সেদিন সহস্র-শীর্ষ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, এর তাৎপর্য ও মহিমা বুঝতে পেরেই বুঝি ব্রিটিশশক্তিকে অচিরকালের মধ্যে শাসন-দণ্ড পরিত্যাগ করে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। সেদিন যারা বিজয়ীর বেশে লালকেল্লায় আসতে পারেনি, তারা যখন বন্দীর বেশে এলো সেখানে তখন সেই বন্দীদের বন্দনায় মুখরিত হয়েছিল আকাশ-বাতাস—উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের কোটি কোটি নর-নারীর হৃদয়। জাতির অন্তরাত্মা সেদিন সত্যিই বলে উঠেছিল—নমস্কার, তোমাদের নমস্কার! আর নেতাজীর উদ্দেশে বলেছিল :

"হে বিজয়ী বীর নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে ;
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক ক্ষয়
তোমারি হোক জয়।"

ভারত ইতিহাসে 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু' এই নামটি এবং তাঁর কর্মকীর্তি দুই-ই অমরত্ব লাভ করেছে—এ কথা আজ নিঃসংশয়ভাবেই বলা যায়। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার মধ্যে যে ধারাবাহিক ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে আজ তার সম্যক আলোচনার প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্রের অত্যাশ্চর্য জীবনের সাধনা ও তাঁর সিদ্ধি দুই-ই আজ সুপরিচিত। তাঁর অতুলনীয় দেশপ্রেম, তাঁর আপোষহীন সংগ্রামী মনোভাব, আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে যেমন একটি নূতন অধ্যায় রচনা করে দিয়েছে, তেমনি তাঁর সামরিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা তাঁর নেতৃত্বকে দিয়েছে এক নূতন ব্যঞ্জনা। দেশপ্রীতি, দুর্জয় সাহস, অসীম কর্মশক্তি—কী না ছিল তাঁর ; কিন্তু সকলের উপর আকর্ষণীয় হোল তাঁর চরিত্র। চরিত্রবলে তিনি যেন একেশ্বর সূর্য। এই দুঃসাহসিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বুঝতে না পারলে তাঁর বিষয়ে আমাদের ধারণা ও সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ হবে না।

সুভাষ-চরিত্রের সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়েছেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিলীপকুমার। তিনি লিখেছেন: "আমার মনে হোত সুভাষ স্বপ্নাশ্রয়ী আদর্শবাদী। তিনি ছিলেন বিপ্লবী, অসমসাহসী বীর, বাস্তববাদী সংগঠনকারী।....সুভাষ সাধারণতঃ একটু অধীর প্রকৃতির লোক ছিল; স্বভাবতঃই সে আবেগের বশে চলত বেশি। পরাধীনতার বোঝা আর তার ওপর তার ভগ্নস্বাস্থ্য এই দুটোই

তার অস্থিরতার প্রধান কারণ। সুভাষ প্রায়ই বলত—'যে জীবনে আদর্শ আর দুঃসাহসিকতা নেই, সে জীবন জীবনই নয়।' এ শুধু তার কথার কথা ছিল না—সত্যিই সে তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত।···ভারতবর্ষ তার কাছে মাটির দেশ ছিল না, ভারতবর্ষ ছিল ভারতমাতা। রক্তমাংসের মানবী মায়ের মতই এই দেশমাতৃকা তার সন্তানদের জন্য অশ্রু বিসর্জন করেন—সুভাষ সেটা অনুভব করত।···তার সংকল্পের দৃঢ় সমুজ্জ্বল বলিষ্ঠ তরবারি বাধা পেলে ঘর্ষণে ঘর্ষণে জ্বলে উঠত, তার আগুনের স্ফুলিঙ্গ পড়ত এদিক ওদিক ঠিকরে, কিন্তু কখনই মাটির মত হারিয়ে ফেলত না নিজের স্বরূপকে। তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তার জীবনের শেষ অভিযান—ইচ্ছাশক্তি কত বলশালী হলে মানুষ এমন অসম্ভব সংকল্পে নিজেকে ঠেলে দিতে পারে। হয়ত সে কখনও ভুল করেছে, হয়ত সে অনেক সময়ে তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেনি, কিন্তু মানুষ ছিল সে, একথা তো মিথ্যা নয়।"

সুভাষচন্দ্র ছিলেন স্বপ্নদর্শী দেশপ্রেমিক।

বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দের দেশপ্রেমের স্বপ্ন যেন তাঁরই জীবনোৎসর্গের মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে। তাঁর অন্তরে সতত যে আবেগপ্রবাহ ছিল তাই-ই তাঁকে বারবার দুঃসাহসিক পথে ঠেলে দিয়েছে। ব্যক্তিগত সুখ বা স্বার্থ বলে তাঁর কিছু ছিল না। এখানে তিনি সন্ন্যাসীর মত নির্লিপ্ত উদাসীন। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সকল রকম স্বার্থকে দেশের স্বার্থের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে আর কেউ পারেনি যেমন পেরেছিলেন সুভাষচন্দ্র—এ কথা আমরা প্রতিবাদের আশঙ্কা না রেখেই বলব।

সুভাষচন্দ্র বিপ্লবী।

বিপ্লবী বাঙলার ঐতিহ্যে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যে মুক্তিসংগ্রাম তিনি ভারতের বাইরে সংগঠন ও পরিচালনা করেছিলেন তার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন বাঙলার

কল্লোলময়ী বৈপ্লবিক ভাবধারা থেকে। তিনি নিজেই বলেছেন: "এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙলাদেশে যে বিপ্লবী আন্দোলন হয়েছিল সেইটাকেই আমি প্রকৃত আন্দোলন এইজন্য বলছি যে, এর ফলেই সর্বপ্রথম আমাদের পর-পদানত দেশের অসহায় জাতি তার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। এই আন্দোলনের ফলেই জাতীয় জাগরণের প্রথম উন্মেষ হয়েছে—আমরা বুঝতে পেরেছি যে বিশাল সংগঠিত শাসকশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করার মতোন ক্ষমতা আমাদের আছে।"

বিপুলবীর্যসম্ভার নিয়ে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে। একটা অদম্য গতি নিয়ে তিনি ছুটেছেন সংগ্রামের পথে; পথ যতই দুর্গম হয়েছে—তিনি হয়েছেন ততই দুঃসাহসিক, তাঁর অভিযান হয়েছে ততই তীব্র। কোমলে-কঠোরে এমন আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ভারতের সমকালীন রাজনীতিতে আর দেখা যায়নি। ভারতবর্ষকে তিনি ভালবাসতেন। ভারতের তমসাবৃতা দুঃখ-রাত্রির চিন্তায় বেদনায় গাঢ় হয়ে উঠত তাঁর মুখ। শুধুমাত্র দেশকর্মী হলে সুভাষচন্দ্র হয়ত ছক-কাটা পথ অনুসরণ করেই দেশের সেবা করতেন; কিন্তু, তাঁর নিজের কথায়—সবাই যে পথে যায়, সে পথ তাঁর ছিল না। "দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর জীবনই আমাকে বারবার আকর্ষণ করে।" এই কথার মধ্যে আমরা পাই ভাবপ্রবণ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রকে।

বাঙলা দেশকে তিনি যে কত ভালবাসতেন তার পরিচয় আছে বন্দীজীবনের একটি পত্রে। মান্দালয় জেল থেকে তাঁর এক সতীর্থকে সুভাষচন্দ্র লিখেছিলেন: "দেশের ও কালের ব্যবধান সোনার বাঙলাকে আমার কাছে কত সুন্দর, কত সত্য করে তুলেছে তা আমি বলতে পারি না। দেশবন্ধু তাঁর বাঙলার

গীতিকবিতায় বলেছেন, 'বাঙলার জল, বাঙলার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে।' এ উক্তির সত্যতা কি এমন ভাবে বুঝতে পারতুম, যদি এখানে এক বৎসর না থাকতুম?... প্রাতে অথবা অপরাহ্নে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণেকের জন্য মনে হয়, মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত তাদের মারফৎ অন্তরের কথা কয়েকটা বঙ্গ-জননীর চরণ-প্রান্তে পাঠিয়ে দিই। সন্ধ্যার নিবিড় ছায়ার আগমনে দিবাকর যখন মান্দালয় দুর্গের উর্ধ্ব প্রাচীরের অন্তরালে অদৃশ্য হয়, অস্তগমনোন্মুখ দিনমণির কিরণজালে যখন পশ্চিমাংশ সুরঞ্জিত হয়ে উঠে এবং সেই রক্তিম রাগে অসংখ্য মেঘখণ্ড রূপান্তর লাভ করে দিবালোক সৃষ্টি করে—তখন মনে পড়ে সেই বাঙলার আকাশ বাংলার সূর্যাস্তের দৃশ্য। এ কাল্পনিক দৃশ্যের মধ্যে যে এত সৌন্দর্য রয়েছে তা কে পূর্বে জানত! প্রভাতের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা যখন দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত করে এসে নিদ্রালস নয়নের পর্দায় আঘাত করে বলে, 'অন্ধ জাগো'—তখনো মনে পড়ে আর একটা সূর্যোদয়ের কথা, যে সূর্যোদয়ের মধ্যে বাঙলার কবি, বাঙলার সাধক বঙ্গ-জননীর দর্শন পেয়েছিলেন।"

স্বপ্নদর্শী বিপ্লবী এখানে একজন ভাবুক কবি।

বাঙালী সুভাষচন্দ্র বাঙলাদেশের প্রতি কি গভীর মমতা পোষণ করতেন তাঁর হৃদয়ে, তার পরিচয় আমরা আর একবার পেলাম পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ে যখন দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া বাঙলার আকাশ ছেয়ে ফেলেছিল আর লক্ষ লক্ষ লোক দু'মুঠো ভাতের জন্য হাহাকার করে পথে-প্রান্তরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিল। তিনি তখন পূর্ব-এশিয়ায়; সেইখানে বসে এই দুঃসংবাদ পেয়ে নেতাজী কতদূর বিচলিত হয়েছিলেন তা আমরা জানতে পারি তাঁর এইসময়কার কয়েকটি বেতার-বক্তৃতায়। ১৯৪৩, ২৫শে আগস্টের বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন:

“বর্তমানে ভারতে, বিশেষ করে বাঙলায় এবং কলিকাতা শহরে দুর্ভিক্ষ ভীষণভাবে দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে এই সমস্ত সংবাদ এসে পৌঁছানোর ফলে পূর্ব-এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ ভারতবাসীর কল্যাণচিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং ভারতবাসীদের যথোচিত সাহায্যদানে যথাসাধ্য চেষ্টা ও প্রয়োজনীয় উপায় উদ্ভাবন করছে। আজ আমি আনন্দের সঙ্গে একথা ঘোষণা করছি যে বাঙলার দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে একলক্ষ টন চাল ভারতে রপ্তানীর প্রতীক্ষায় রয়েছে। এই চাল সম্পূর্ণভাবে ও বিনাশর্তে ভারতবাসীদের জন্যই এবং তাদের মধ্যে বিতরণের জন্য ভারতের নিকটস্থ কোনো বন্দরে মজুত রয়েছে।”

সকলেই জানেন, ইংরেজের চক্ষে সুভাষচন্দ্র তখন ‘দেশদ্রোহী’ বলে বিবেচিত হয়েছিলেন, তাই শাসকবর্গ তাঁর এই সাহায্য গ্রহণ করেন নি।

বাঙলাদেশ যেমন তাঁর অন্তরে স্থান পেয়েছিল, বাঙালি জাতিব ভবিষ্যতের ওপরও তেমনি সুভাষচন্দ্রের ছিল গভীর আস্থা। স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙালী অগ্রগণ্য হবে—এ আশা তিনি চিরদিন পোষণ করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন: “আমার মনের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই যে ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবেই এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রধান গুরুভার বাঙালিকে বহন করতে হবে।... ভগবান আমাদের অর্থের সম্পদ দেন নাই বটে কিন্তু তিনি আমাদের প্রাণের সম্পদ দিয়েছেন। বাঙালিকে এই কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে—শুধু ভারতবর্ষে কেন—পৃথিবীতে তার একটা স্থান আছে—এবং সেই স্থানের উপযোগী কর্তব্যও তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে। বাঙালিকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, আর স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভারত গড়ে তুলতে হবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প-কলা, শৌর্য-বীর্য, ক্রীড়া-

নৈপুণ্য, দয়া-দাক্ষিণ্য—এইসবের ভিতর দিয়ে বাঙালিকে নূতন ভারত সৃষ্টি করতে হবে। জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করবার শক্তি এবং জাতীয় শিক্ষার সমন্বয় করবার প্রবৃত্তি একমাত্র বাঙালির আছে।···বাঙালি সর্বস্ব পণ করে আবার স্বাধীনতার জন্য পাগল হয়ে উঠবে; দেশ আবার স্বাধীনতালাভের জন্য বদ্ধ-পরিকর হবে।"

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রারম্ভে স্বদেশসেবার পুণ্যব্রতে বাংলার তরুণদের আহ্বান করে সুভাষচন্দ্র যে কথা বলেছিলেন আজো তা তার মূল্য হারায়নি। সেদিন তাঁর মধ্যে দেশপ্রেমের যে দীপক রাগিণী বেজে উঠেছিল, কালের প্রান্তর অতিক্রম করে আজো তা আমাদের অনুপ্রাণিত করে তোলে। তিনি বলেছিলেন: "বঙ্গজননী আবার একদল নবীন তরুণ সন্ন্যাসী চান। ভাই সকল, কে তোমরা আত্মবলির জন্য প্রস্তুত আছ, এসো। মায়ের হাতে তোমরা পাবে দুঃখ, কষ্ট, অনাহার, দারিদ্র্য ও কারাযন্ত্রণা। যদি এইসব ক্লেশ ও দৈন্য নীরবে নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করতে পার—তবে তোমরা এগিয়ে এসো।· হে আমার তরুণ জীবনের দল, তোমরাই তো দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করেছ। ওগো বাঙলার যুবক সম্প্রদায়, স্বদেশসেবার পুণ্যযজ্ঞে আমি তোমাদের আহ্বান করছি। তোমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছ, ছুটে এসো। ভারতের নবজাগ্রত জাতীয় আত্মা আজ মুক্তির জন্য হাহাকার করছে।"

ঠিক এমনি আহ্বান তিনি জানিয়েছিলেন নেতাজীরূপে তাঁর আজাদী সৈনিকদের—ঠিক এমনিভাবেই তিনি তাদের অনুপ্রাণিত করে তুলেছিলেন তাদের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক একদিন বিচার করবেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রের কর্মকীর্তির কথা। আজ আমরা শুধু এই কথা বলব যে, ভারতের স্বাধীনতা এত শীঘ্র লাভ করবার

সর্বপ্রধান কারণ সুভাষচন্দ্রের শেষ আঘাত। একথা আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতের রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্রের মতোন একজন বিপ্লবীর আবির্ভাব না ঘটত, তা'হলে গান্ধী ভারত-বাসীর বৈপ্লবিক মনোভাব বা উদ্যমকে নিঃশেষে শুষে নিতে পারতেন। গান্ধী-যুগে একমাত্র সুভাষচন্দ্রই বৈপ্লবিক কর্মপন্থা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এইজন্যই প্রখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিক মাইকেল এডওয়ার্ডস তাঁর "ব্রিটিশ ভারতের শেষ কয় বৎসর" গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে এই কথা বলেছেন: "Inaia owes more to him than to any other man."

নেতাজীর প্রতি ভারতবাসীর এই ঋণের কথা আমরা যেন কখনো বিস্মৃত না হই। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গান্ধী অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিপ্লব-বিরোধিতার ভূমিকায় আর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা ছিল ঠিক তার বিপরীত—তিনি বিপ্লবের জয়রথকে সমস্ত বাধা-বিপত্তি, দলীয় চক্রান্ত এবং আপোষমূলক মনোভাবের ভিতর দিয়ে সগৌরবে চালিত করে ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন। তিনিই প্রকৃত দেশনায়ক।

ভারতের স্বাধীনতায় সুভাষচন্দ্রের দানের কথা আলোচনা করতে হলে তাঁর মধ্যে যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেখা যায় তার উল্লেখ করতে হয়। তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়ে এর পরিচয় আমরা বার বার পেয়েছি। ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য বার্লিন থেকে তিনি যে বেতার ভাষণ দিয়েছিলেন, সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই দূরদর্শিতা দেখা গেল ওয়াভেল প্রস্তাবের সময়। সেই সময় আজাদ হিন্দ রেডিও, সাইগন থেকে তিনি যে কয়টি ভাষণ দিয়ে, ওয়াভেল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য কংগ্রেসী নেতাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লর্ড ওয়াভেল তখন ভারতের বড়লাট। ইংলণ্ডে তখন রাজনৈতিক পটপরিবর্তন আসন্ন হয়ে এসেছে। যুদ্ধের মধ্যে রক্ষণশীল দলের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করেন ; এই নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল শ্রমিক দল। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ভারতবর্ষে ওয়াভেলের নায়কত্বে সিমলায় এক নেতৃ-সম্মেলনের আয়োজন হয়। এটা ছিল চার্চিল-চালিত রক্ষণশীল দলের কূটনীতির এক ভাঁওতা। সিমলা বৈঠকের বিস্তারিত বিবরণে আমাদের প্রয়োজন নেই। ওয়েভেল-পরিকল্পনার মূল কথা ছিল—ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বড়লাটের শাসন পরিষদকে জনগণের প্রতিনিধিমূলক শাসন পরিষদরূপে গঠন করা।

ভারতে যখন রফা করার আগ্রহ নিয়ে জওহরলালপ্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ওয়াভেল প্রস্তাব বিচার করছিলেন, ভারতের বাইরে থেকে নেতাজী তখন প্রকৃত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিভাবে এর বিচার করেছিলেন তার পরিচয় আছে ঐ সময়ে সায়গন ও সিঙ্গাপুর থেকে বেতারে প্রদত্ত পাঁচটি বক্তৃতার মধ্যে। এগুলি তাঁর রাজনৈতিক প্রতিভা ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আশ্চর্য নিদর্শন। কংগ্রেস নেতৃবর্গ, ক্রীপস প্রস্তাবের পটভূমিকায় ওয়াভেল প্রস্তাব অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন ; নেতাজী কিন্তু তা করেন নি। ১৮ই জুন ১৯৪৫-এর বেতার ভাষণে তিনি বললেন : "ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও লর্ড ওয়াভেল আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন যে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলে আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পৌঁছব, কিন্তু বাস্তবিক তাও বলা যায় না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বায়ত্তশাসন ভারতবাসীরা আর চায় না। পূর্ণ স্বাধীনতা না পেলে তারা সন্তুষ্ট হবে না।...এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে স্বায়ত্তশাসন লাভ করবার সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যাবে সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই—স্বাধীনতার কথা নাই বা তুললাম।"

নেতাজীর বক্তব্য এই ছিল যে, ওয়াভেল প্রস্তাব গ্রহণ করার অর্থ ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করা। সেই সময়ে সুদূর প্রাচ্যে অভিযান চালাবার মতোন সৈন্যবল ব্রিটেনের ছিল না—পাঁচ লক্ষ সৈন্য দরকার ছিল তখন আর ভারতীয় জনমত ভিন্ন ইহা সংগ্রহ করা অসম্ভব জেনেই ওয়াভেল প্রস্তাব করা হয়েছিল অত্যন্ত কৌশলে। একমাত্র সুভাষচন্দ্রই সেদিন ব্রিটিশের এই কূটনীতি ভেদ করতে পেরেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতায় তিনি তাই বলেছিলেন; "এই প্রস্তাব আলোচনা করতে হলে কংগ্রেসের চিরদিনকার নীতি ও বিশ্বাস বিসর্জন দিতে হবে।··· আপনাদের কাছে আমি তাই অনুরোধ করছি এই নির্লজ্জ পাপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুন।" এই বক্তৃতায় (এটি প্রকৃতপক্ষে ছিল অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্টের একটি বিবৃতি) সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় ভারতের অবস্থা আলোচনা করে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপ যেভাবে উদ্ঘাটিত করেছিলেন, তার তুলনা নেই। এখানে তিনি একাধারে একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ ও দেশপ্রেমিকরূপে প্রতিভাত হয়েছেন।

২০শে জুনের বক্তৃতায় ওয়াভেল প্রস্তাবের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে নেতাজী আর একটি বেতার ভাষণ দিলেন এবং তাতে তিনি আরো জোরের সঙ্গে বললেন; "আজ ১৯৪৫ সালে আমাদের সামনে ওয়াভেল প্রস্তাব উত্থাপিত। আমাদের বলা হয়েছে যে সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ করতে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করে দিতে কংগ্রেস রাজী হলে দুটো বিষয়ে তার লাভ হবে, উপরন্তু ভবিষ্যতে স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিশ্রুতিও আছে। সেই দুটো বিষয় হচ্ছে বড়লাটের শাসন পরিষদের কয়েকটা চাকুরি এবং প্রদেশগুলোতে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব। ভারতবর্ষ থেকে যেসব সংবাদ আমি পাচ্ছি তাতে মনে হয় যে প্রদেশে মন্ত্রিত্ব ও শাসন পরিষদের আসনে কংগ্রেস তুষ্ট হয়ে ওয়াভেল প্রস্তাব আলোচনা করছে।···এই প্রস্তাব গ্রহণ করে

দেশের কি লাভ হবে? আমি বিচার করে দেখেছি যে কংগ্রেসের একমাত্র লাভ হবে শাসন পরিষদের কয়েকটা পদ কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ও মুসলিম লীগ উভয়েরই খুব বেশি লাভ হবে।"

হতাশ ও পরাভূত মনোভাব তখন জাতির জীবনে দেখা দিয়েছে; কংগ্রেসী নায়কবৃন্দ রণক্লান্ত—পরাজয় স্বীকারের পথে পদক্ষেপে তাঁরা যখন উদ্যত, ঠিক সেই সংকট মুহূর্তে নেতাজী তাঁর দেশবাসীব উদ্দেশে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন: "ব্রিটেনের সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধে যোগ দিলে কংগ্রেসের সংগ্রামশীল বৈপ্লবিক জাতীয়তা-বাদের উদ্দেশ্য লোপ পাবে। কংগ্রেস জনগণের প্রতিনিধি, এই দাবী স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে ভারতের একটি রাজনৈতিক দল ব'লে নিজেদের এইভাবে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ রাজনৈতিক আত্মহত্যা।"

এই আত্মহত্যা থেকে সেদিন জাতিকে রক্ষা করেছিলেন নেতাজী। সেই সময়ে তিনি যেরকম দিনের পর দিন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াভেল প্রস্তাব আলোচনা করেছিলেন তা সত্যিই তাঁর বিস্ময়কর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। সেদিন একমাত্র তিনিই এই প্রস্তাবের রাজনীতিক ও সাম্প্রদায়িক দিক যেভাবে আলোচনা করেছিলেন তা তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি সিমলা বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য লর্ড ওয়াভেলেব আমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করল, সেই দুঃসংবাদ পেয়ে ২২শে এবং ২৩শে জুন আরো দুদিন বেতারভাষণে নেতাজী ওয়াভেল প্রস্তাব বর্জন করার জন্য সনিবন্ধ আবেদন জানালেন। ভারতের দুর্ভাগ্য, তাঁর এই আবেদন ব্যর্থ হয়; কংগ্রেস রাজনৈতিক আত্মহত্যা করে ওয়াভেল প্রস্তাবে সম্মত হল।

## ১৩

"Subhas is a flaming sword."

এই দুইটি কথায় সরোজিনী নাইডু সুভাষ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করেছেন। সত্যিই আমরা যখন সেই দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব সমন্বিত দেশপ্রেমিকের জীবন ও জীবন সাধনার কথা চিন্তা করি, তখন তাঁকে একখানি কোষমুক্ত জ্বলন্ত তরবারি বলেই আমাদের মনে হয়। ভারত ইতিহাসে যাঁদের বীরত্ব স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে সেই রাণা প্রতাপ, শিবাজী প্রমুখ মুঘল যুগের বীরদের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের তুলনা চলে। তেমনি সিপাহী বিপ্লবের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে যাঁরা ব্রিটিশ শক্তিকে আঘাত হেনেছিলেন তাঁদের অনেকের সঙ্গেই অনেক বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের তুলনা করা চলে। আবার অগ্নিযুগের বাংলায় তাঁর আগে যেসব দেশপ্রেমিক সন্তান বিপ্লবের পতাকা তুলে ধরেছিলেন তাঁদের অনেকের আত্মবলিদানের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আত্মবলিদান তুলনীয়। কিন্তু শুধু তুলনা দ্বারা এই প্রাণ-চঞ্চল মানুষটির বীরত্বের পরিমাপ করা যায় না। তাঁর মধ্যে এমন কতকগুলি দুর্লভ গুণের সমাবেশ হয়েছিল যা তাঁর চরিত্রে একটা স্বতন্ত্র মহিমা আরোপ করেছে। ভারতের স্বাধীনতা আর সুভাষচন্দ্র বসু—এক এবং অভিন্ন হয়ে আমাদের কাছে আজ কেন প্রতীয়মান হয়? কংগ্রেস রাজনীতিতে তিনি যেদিন থেকে পরাভূত মনোভাব লক্ষ্য করলেন, আমার মনে হয়, সেদিন থেকে তিনি কোষমুক্ত তরবারির ঋজুতা ও তীক্ষ্ণতা নিয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভারতের রাজনীতিতে একটা নূতন চেতনা এনে দেওয়ার জন্য। সেই চেতনার একটিমাত্র অর্থ ছিল—স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু। সুভাষ-নেতৃত্বের এই দিকটা আজো তেমনভাবে আলোচিত হয়নি। আজ হওয়া দরকার।

**সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করে কি ভুল করেছিলেন ?**

সেই ১৯৪১ সাল থেকে এই প্রশ্ন অনেকের মনেই জেগেছিল এবং এই বিষয়ে সুভাষ-অনুরাগী ও সুভাষ-বিরোধীদের মধ্যে প্রবল মতদ্বৈধ দেখা যায়। কিন্তু সুভাষচন্দ্র নিজেই এই সম্পর্কে যা বলে গিয়েছেন আমার বিবেচনায় তা সর্বতোভাবেই গ্রহণযোগ্য। ১৯৪৪ সালের ৭ই জুলাই রেঙ্গুন থেকে গান্ধীর উদ্দেশে তিনি যে প্রসিদ্ধ বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন তার এক জায়গায় তিনি বলেছেন :

"দেশত্যাগ করবার আগে আমাকে ভেবে ঠিক করতে হয়েছে বিদেশ থেকে সাহায্য চাওয়া ঠিক হবে কি না। আগে আমি পৃথিবীর সমস্ত বিপ্লবের ইতিহাস পড়েছি, পরে অনুসন্ধান করেছি কি উপায়ে অন্য দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু আমি একটি দেশের ইতিহাস দেখিনি যে, কোনো পরাধীন জাতি বিদেশীর কোনোরকম সাহায্য না নিয়ে স্বাধীন হয়েছে। ১৯৪০ সালে আমি আবার ইতিহাস মন দিয়ে পড়েছি। পড়ে সিদ্ধান্ত করেছি যে, কোনো দেশই বাহিরের সাহায্য ভিন্ন স্বাধীনতা অর্জন করেনি। নীতির দিক থেকে বাহিরের সাহায্য নেওয়া উচিত কি না, সে সম্বন্ধে আমি প্রকাশ্যে ও ব্যক্তিগত আলোচনায়ও সব সময়েই বলেছি যে ঋণ হিসাবে এই সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।"

এই বিশ্বাসেই তো সুভাষচন্দ্র দুস্তর পথে অগ্রসর হয়ে অভিযান করে তাঁর জীবন ও ভবিষ্যৎ বিপদাপন্ন করেছিলেন। এই বিশ্বাসেই তিনি ভারতের বাইরে গিয়ে ভারতীয় আভ্যন্তরীণ আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। সেই তাঁর দুঃসাহসিক প্রয়াসের সফলতা বা বিফলতা যাই হোক, তাঁর আন্তরিকতায় কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে ?

শাহ্‌নওয়াজ লিখেছেন : "I do not know in what proportion the man, the soldier and the statesman

in him were blended. At home the man in him seemed to dominate ; at the front and in the midst of his troops, the soldier in him shone in splendid glory, and in the councils and conferences and at his desk his brilliant statesmanship made a profound impression on one and all of us." মানুষ, সৈনিক ও রাজনীতিজ্ঞ—সুভাষ-নেতৃত্বের এই তিনটি বিভিন্ন দিক আলোচনা করলে আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই যে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তাঁর কাছে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই একটি অবধারিত সত্য বলে স্বীকৃত হয়েছিল। এই চেতনা তাঁর মধ্যে কি পরিমাণ তীব্র ছিল তা বুঝতে হলে তাঁর 'ভারতীয় সংগ্রাম' বইখানি যত্নের সঙ্গে পড়তে হয়! স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন অনেকেই, ত্যাগস্বীকার ও দুঃখবরণ করেছেন অনেকেই, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মধ্যে আমরা যে মহত্ব দেখতে পাই তা অন্যের মধ্যে পাই না। সুভাষ-নেতৃত্বের এই বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে হিউগ টয় লিখেছেন: "There was an element of greatness of the single-minded dedicated leader.…By the magnitude of his conception, by the example of his magnetic, burning zeal, his tenacity and personal force, by the tradition he left of sacrificial patriotism, must be measured the stature of Subhas Chandra Bose." সত্যি, ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এই একক, আত্মনিবেদিত নেতৃত্বের তুলনা বিরল। সুভাষ-চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানেই।

সুভাষচন্দ্রের *Indian Struggle* বইখানির ছত্রে ছত্রে তাঁর রাজনৈতিক জীবনদর্শন উদ্ভাসিত হয়েছে। ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের

এমন ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণ আমরা এর আগে আর কারো লেখার মধ্যে পাইনি। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ফলাফল, হিন্দু-মুসলমান্ সমস্যা, ধর্ম ও জাতীয়তা, অহিংসা ও রাজনীতির ওপর অতিরিক্ত আধ্যাত্মিকতা আরোপ করতে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর আদর্শের সংঘাত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীর ভূমিকা ও গান্ধী-নেতৃত্বের ব্যর্থতা প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের চিন্তা যে কত গভীর ও বাস্তব ছিল, তা জানতে হলে এই বইখানি পড়তে হয়। পলাশির যুদ্ধের পর থেকে ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক ইতিহাসের আরম্ভ, সেই ইতিহাস মন্থন করে সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা সম্পর্কে আমাদের যে নূতন বোধ বা philosophy দিয়ে গেছেন, আজো তার সম্যক অনুশীলন হয়েছে বলে মনে হয় না। বস্তুতঃ সুভাষচন্দ্রের এই বইখানি আমাদের রাজনৈতিক 'জীবনবেদ' হিসাবে স্বীকৃত হওয়া উচিত। এর প্রতিটি অধ্যায়ে আছে তাঁর সুগভীর জ্ঞান, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য আর আছে সেই সঙ্গে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণ। নেহরুর আত্মজীবনীতে আমরা পাই তাঁর আত্মকীর্তন, একদেশদর্শিতা ও গান্ধি-স্তুতি; কিন্তু সুভাষচন্দ্রের বইখানি আন্তরিকতাপূর্ণ, নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত হওয়ার দরুণ ইহা নিঃসন্দেহে একটি প্রথম শ্রেণীর ইতিহাসের মর্যাদা লাভ করেছে। মুক্তিকাম পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের বিরাট প্রতিভা, অদম্য কর্মশক্তি, অতুলনীয় স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের মহিমা ও রহস্য বুঝতে হলে প্রত্যেক ভারতবাসীর এই বইখানি পড়া দরকার।

আমরা দেখেছি emotion বা আবেগ সুভাষ-চরিত্রের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য; কিন্তু এই গ্রন্থরচনায় কোথাও সেই আবেগের স্পর্শ নেই। সংগ্রামের তীব্র প্রবাহ এর প্রতিটি অধ্যায়ে যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে—পরাধীনতার বেদনা অভিব্যক্ত হয়েছে এর প্রতিটি ছত্রে। গান্ধী-নেতৃত্বের ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করে সুভাষচন্দ্র

লিখেছেন: "The future of India rests exclusively with those radical and militant forces that will be able to undergo the sacrifices and suffering necessary for winning freedom." তিনি আরো বলেছেন: "The fate of India is indissolubly linked up with the fate of humanity." এই যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, ইহাই সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেমকে আমাদের কাছে সর্বকালের জন্য স্মরণীয় ও বরণীয় করে রাখবে।

কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্যে তিনি কারো চেয়ে কম ছিলেন না, কিন্তু আদর্শের সংঘাতই একদিন তাঁর ও কংগ্রেসের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রচনা করেছিল। নিঃসন্দেহে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ইহা একটি শোচনীয় ঘটনা। মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা ছিল বলেই গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটেছিল, নতুবা গান্ধীর প্রতি তিনি কারো চেয়ে কম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। পূর্ব-এশিয়ায় তিনি যখন সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তখন তিনি বেতারভাষণে কতবার গান্ধীর উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদন করেছেন। কারাগারে কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যুর পরে তাঁকে ভারতের জাতীয় মাতার সম্মান জানিয়ে সুভাষচন্দ্র যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা স্মরণীয় হয়ে আছে।

"Subhas is freedom personified."

"সুভাষ মূর্তিমান স্বাধীনতা।"

এই কথা বলতেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি। সুভাষ-চন্দ্রের এত বড়ো অনুরাগী আমি আর দুটি দেখিনি। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, তিনি ভারতবর্ষ থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে শিশিরকুমার প্রতি বৎসর ২৩শে জানুয়ারি তাঁর মঞ্চে নেতাজী জন্মদিবস পালন করতেন এবং তাঁর শ্রীরঙ্গম বন্ধ হওয়া পর্যন্ত কখনো

এর ব্যতিক্রম হতে দেখিনি। ঐদিন তিনি সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অতুলনীয় দানের কথা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করতেন। শ্রীরঙ্গম বন্ধ হওয়ার ঠিক আগের বছরটিতে ঐ মঞ্চে 'নেতাজী জন্মদিবস' উৎসবে নাট্যাচার্য যে অপূর্ব ভাষণটি দিয়েছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন :

"ওরা বলে সুভাষ কুইসলিং, সুভাষ ফ্যাসিস্ট। গান্ধী-নেহরু-দলের লোকদের আমি জিজ্ঞাসা করি, সুভাষ কি কোনোদিন তোমাদের মতোন negotiated settlement-এর নিরুদ্বেগ কুসুমাস্তীর্ণ পথে চলেছিল? জিজ্ঞাসা করি, দেশের কাজে তার মতোন দুঃখ-কষ্ট কে স্বীকার করেছে? কে অমনভাবে পেরেছে স্বার্থত্যাগ কবতে? ভারতের স্বাধীনতার বেদীমূলে সুভাষ যেন একটি পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। ওদের অনেকের মধ্যে আমি দেখেছি শুধু আত্মম্ভরিতা, একমাত্র সুভাষের মধ্যে দেখেছি আত্মত্যাগ। এই ছিল তার নেতৃত্বের বনিয়াদ। তার জীবনের সকল মুহূর্ত ব্যেপে ছিল শুধু একটি মহৎ উদ্দেশ্য—ব্রিটিশ শক্তিকে ধ্বংস করে দেশকে স্বাধীন করব। এই বিপ্লবী প্রেরণাই তো তাকে দেশত্যাগী করেছিল। তার জীবন জীবনোৎসর্গে সার্থক। শাসক-শক্তিকে তিনিই প্রকৃত আঘাত হানতে পেরেছিলেন—ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত্তিমূল তিনিই কাঁপিয়ে দিতে পেরেছিলেন। আমি জানি, ষোল বছর ধরে জীবনের সব কিছু উৎসর্গ করে তুমি দেশমাতার দাসত্ব শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টা করেছ। তোমাকে ওরা কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে তোমার দেশসেবার চরম পুরস্কার দিয়েছে—একথা যেন বাঙালী কোনোদিন বিস্মৃত না হয়। আমি জানি, তোমার চরিত্রে কোনো দৈন্য ছিল না, তুমি ছিলে বিরাট পুরুষ, সারাজীবন ধরে তুমি একটা বিরাট কিছুকে রূপ দিতে চেয়েছ। তুমি বিপ্লবী, এই আমাদের গর্ব। তুমি মহান্। তুমি আজ তাই তোমার স্বজাতির অন্তরে স্থান পেয়েছ। শরৎচন্দ্রের কথায় বলি—

'তুমি তো আমাদের মতো সোজা মানুষ নও—তুমি দেশের জন্য সব দিয়েছ···তোমাকে অবহেলা করিবে, সাধ্য কার? দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বইতে তুমি পারো বলিয়াই তো ভগবান এতবড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শতকোটি নমস্কার। তুমি চুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলে না—ভারতের মুক্তি অর্জনের জন্য তুমি যে পথ বেছে নিয়েছিলে তাই ছিল দিল্লীর পথ। জয় হিন্দ্।" *

প্রগতিশীলতার প্রতিমূর্তি সুভাষচন্দ্র।

স্বাধীনতার উগ্র তাপস সুভাষচন্দ্র।

পুরুষকারের মূর্ত বিগ্রহ সুভাষচন্দ্র।

আত্মপ্রত্যয়ের জ্যোতির্ময় পুরুষ তিনি।

তিনি জানতেন, দৈবের কাছে প্রার্থনা জানাতে জানাতে পুরুষকার মরেই গিয়েছে আমাদের দেশে—নষ্ট করে দিয়েছে আমাদের সকল কর্মপ্রেরণাকে। তাই তো সুভাষচন্দ্র, বিবেকানন্দের আদর্শের অনুসরণে তাঁর স্বপ্নসিংহাসনে ঈশ্বরের জায়গায় বসিয়েছিলেন তাঁর মাতৃভূমিকে, আর দৈবনির্ভর বা আপোষ-চুক্তির স্থলে অশ্রান্ত সংগ্রামকে। তাঁর অন্তরঙ্গস্থানীয়েরা এই সাক্ষ্য দেবেন যে সুভাষচন্দ্রের সদা স্বপ্নাতুর অথচ দীপ্তিময় চক্ষু দুইটির দৃষ্টিতে আভাসিত হোত স্বাধীনতা—অন্য কিছু নয়। জীবনের দুঃসাহসিকতম অভিযানে তিনি ভুল করেছেন—এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন। আবার অনেকের মতে, "Power corrupted him; he grew more arrogant, more intolerant, more certain." † কিন্তু সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের অনুধাবন এবং তাঁর জীবনের ঘটনাবলী অনুধাবন করলে পরে দেখা যাবে যে, তিনি ভুল করেননি এবং

* লেখক স্বয়ং উপস্থিত থেকে নাট্যাচার্যের এই ভাষণের একটি 'নোট' নিয়েছিলেন।

† হিউগ টয়ের বইয়ের ভূমিকায় ফিলিপ ম্যাসনের উক্তি।

ক্ষমতার গর্বে তিনি কোনোদিনই উদ্ধত বা গর্বিত ছিলেন না। রাজনীতির .ক্ষত্রে তাঁর চুক্তি-বিরোধী মানসিকতাকে অনেকে এইভাবেই ভুল বুঝেছেন।

'শোণিত উৎসর্গ' বা 'Blood sacrifice' ভিন্ন ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটবে না—সুভাষচন্দ্রের এই ধারণার মধ্যে যাঁরা বাস্তবতার অভাব দেখতে পান, আমার মনে হয় তাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকার গুরুত্ব ঠিকমত উপলব্ধি কবতে পারেন নি। তিনি ভারত ইতিহাস থেকেই প্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং নির্দেশ পেয়েছিলেন। তিনি জানতেন যে ১৮৫৭ সালের সশস্ত্র অভ্যুত্থান যেমন ভারতে কোম্পানী রাজত্বের অবসান ঘটিয়েছিল, তেমনি ঐ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথেই ভারতে রচিত হবে ব্রিটিশ শক্তির সমাধিশয্যা। এই বিশ্বাসে তিনি ছিলেন অবিচল। তাঁর দেশপ্রেম যে একটা কতবড়ো sublime passion বা সুমহৎ আকাঙ্ক্ষা ছিল, ভারতের স্বাধীনতায় তাঁর বিশ্বাস যে কি রকম অটল ছিল—তাঁর ঝটিকাময় জীবনের প্রত্যেকটি চিন্তা, প্রত্যেকটি কার্য এরই অভ্রান্ত স্বাক্ষর বহন করে।

সুভাষচন্দ্রের স্থির বিশ্বাস ছিল যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে এবং তাঁর যত কিছু রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও চিন্তাধারা তা তাঁর এই বিশ্বাসকে একাগ্র করেই সর্বক্ষণ আবর্তিত হোত। গান্ধী বা নেহরুর মতোন শাসক-শক্তির সদিচ্ছার ওপব তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন তিনি এবং সেই ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য কবেই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। ১৯৪৩, ১২ই জুলাই ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের মহিলা বিভাগ কর্তৃক আহুত ভারতীয় মহিলাদের এক বিরাট সভায় তিনি যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন তার একস্থলে তিনি বলেছেন :

"ইতিহাস থেকে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি যে, প্রত্যেক

সাম্রাজ্যের যেমন উত্থান হয় তেমনি পতনও হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও পৃথিবী থেকে একদা নিশ্চিহ্ন হবে, এখন সেই সময় এসেছে। আমি স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর এই ভূভাগ থেকে ব্রিটিশ আধিপত্য কেমনভাবে মুছে গিয়েছে। আমাব দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর আরেক স্থান, ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশের একচ্ছত্র প্রভুত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

গান্ধী, নেহরু ও সুভাষচন্দ্র—ভারতবষেব সাম্প্রতিক কালেব রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনটি অবিস্মরণীয় নাম। কিন্তু এই তিন-জনের চিন্তাধারায় কি বিপুল পার্থক্য এবং এই তিনজনেব জীবনদৃষ্টি কি স্বতন্ত্র। একজন ধীর, শান্ত, সমাহিত, আপন শক্তি ও তপস্যার গৌরবে বিরাজমান; দ্বিতীয়জন ছিলেন অফুরন্ত কর্মশক্তির বিদ্যুতাধার, অনির্বাণ উৎসাহ ও যৌবনচাঞ্চল্যের জীবন্তমূর্তি। আর তৃতীয়জন একাধাবে কর্মবীর, বিপ্লবী ও ভাবুক। কিন্তু পরাধীন ভারতে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল শুধু একজনের ওপর—তিনি সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্রই ভারতীয় জনগণের বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত ভাগ্যকে পৃথিবীর শোষিত জন-সাধারণের ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত করে ভারতের মুক্তিসংগ্রামকে সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার মুক্তিকাম জনসমষ্টির সাধারণ সংগ্রামে পবিণত কবেছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীর স্বাধীনতাব আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের বাণীবাহক সুভাষচন্দ্র।

"সেই প্রকৃত বিপ্লবী যে কখনো পরাজয় স্বীকার করে না, কখনো হতাশ হয় না বা দমে যায় না", সুভাষচন্দ্রের এই একটিমাত্র উক্তির মধ্যে আভাসিত হয়েছে তাঁর জীবনব্যাপী স্বপ্ন ও সাধনা। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ভারতের জাতীয়তা একসঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে না। একটিকে বাঁচতে হলে অপরটিকে মরতে হবে। ভারতের জাতীয়তা বেঁচে থাকবেই, কাজেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস হবেই।" সেই ধ্বংসের

পথ তিনি প্রশস্ত করেছিলেন পূর্ব-এশিয়ায় সংগ্রামের আয়োজন করে। তিনি ছিলেন জন্ম-আশাবাদী। তাই পরাজয়ের শেষ মুহূর্তেও সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন: "ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই—অচিরেই সে স্বাধীন হইবে।"

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন।

সুভাষচন্দ্র ভিন্ন এই স্বাধীনতা এত শীঘ্র আসত কিনা তাতে সন্দেহ আছে। এই প্রসঙ্গে মাইকেল এডওয়ার্ডস সত্যিই লিখেছেন: "The fight for India's freedom was now to take place outside India and the actions of one man were to have profound effect upon the future." এডওয়ার্ডস উল্লিখিত এই 'একজন ব্যক্তি' আর কেউ নন—সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর পৌরুষ, উদ্দীপনা, দেশপ্রেম, আপোষ-হীন সংগ্রামী মনোভাব ও আত্মবিশ্বাসের জাগরণমন্ত্রে ভারতের ঘুমন্ত আত্মা জেগে উঠেছিল। ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে "সুভাষচন্দ্র বসু" তাই একটি উজ্জ্বল নাম—অবিনশ্বর নাম।

এই নামের গৌরব-দীপ্তি তাই আজ ইতিহাসের উদয়াচলে নবোদিত সূর্যের মতোন কোটি কোটি ভারতবাসীর চিত্তে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তেজ, বীর্য ও ত্যাগের বিপুল মহিমা হোমের আগুনের মতোন জ্বলে উঠেছিল একদিন তাঁর অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে। তাঁরই জীবনে আমরা দেখেছি ভারতবর্ষে আধুনিক কালের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য সমুদ্রমন্থনের দৃশ্য। আমরা তাই চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব ভারত-ইতিহাসের নায়ক দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রকে।

যুগ থেকে যুগান্তরে প্রতিধ্বনিত হবে এই নাম। আমাদের উত্তরপুরুষ যখন এই বিপ্লবী মহানায়কের কথা আলোচনা করবে

তখন তারা সুভাষচন্দ্রকে ভারতের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে এক স্বতন্ত্র পুরুষ হিসাবে দেখবে। দেখবে—"His is a majestic character." দেখবে—একটি মানুষ কেমন করে ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং একটি উন্নত ও বলিষ্ঠ আদর্শের ভিত্তিতে তিনি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন আগামী দিনের শৃঙ্খলমুক্ত ভারতকে। তাঁর কর্মময় জীবনের কথা, তাঁর অশ্রান্ত প্রাণ-চাঞ্চল্যের কথা মহাকাব্যের মতোই এই দেশের ঘরে ঘরে একদিন পঠিত হবে।

যে বিজয়পতাকা তিনি আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছেন, আমরা যেন তাঁর আদর্শের অনুসরণ করে সেই পতাকা সগর্বে উর্ধ্বে তুলে ধরে রাখতে পারি। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের কথার পুনরুক্তি করে বলি, আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে সুভাষচন্দ্রের চারিত্র-শক্তিকেই সমগ্র দেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।